বঙ্গ কমলবার্তা

জানুয়ারি সংখ্যা। ২০২৫

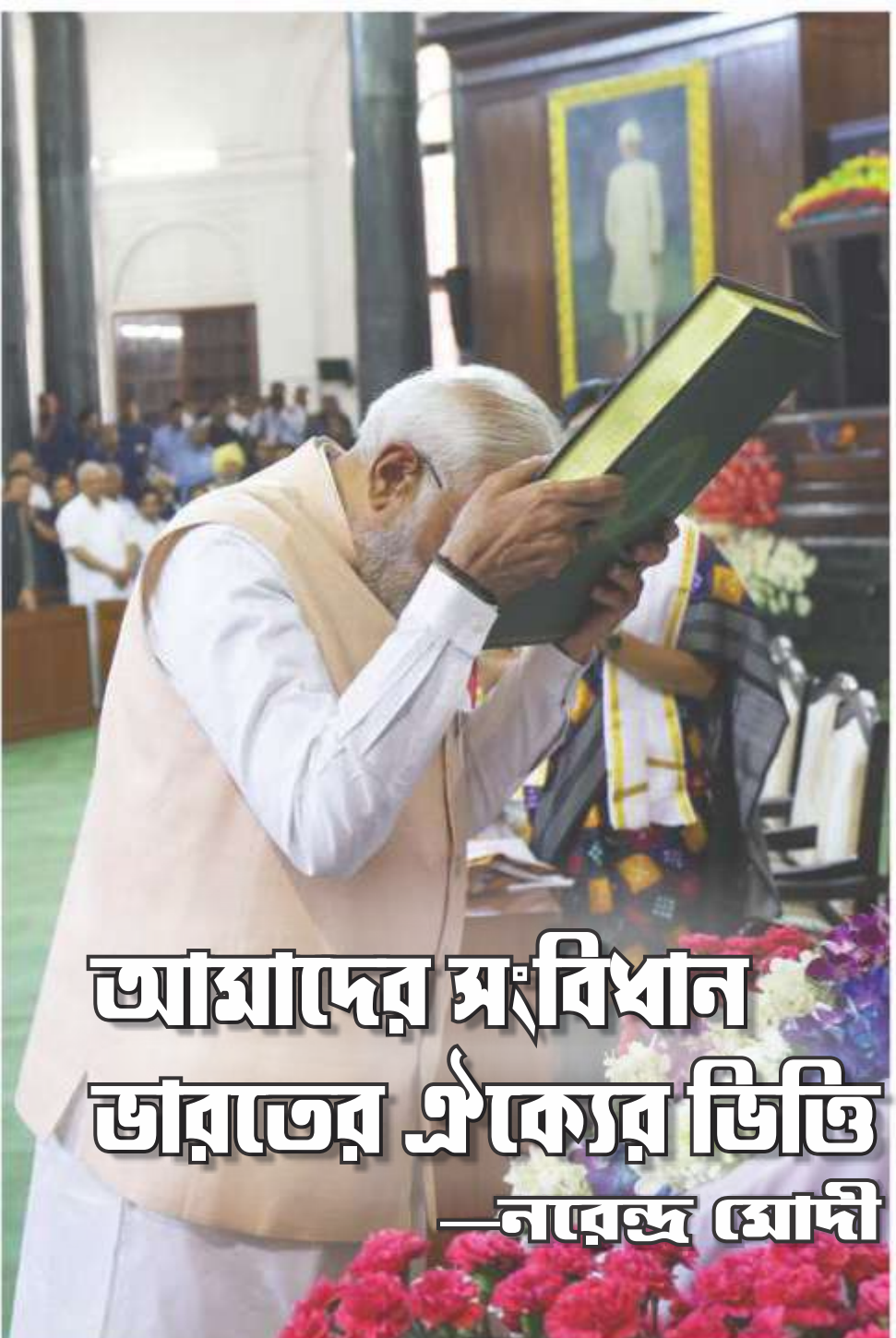

আমাদের সংবিধান ভারতের ঐক্যের ভিত্তি

—নরেন্দ্র মোদী

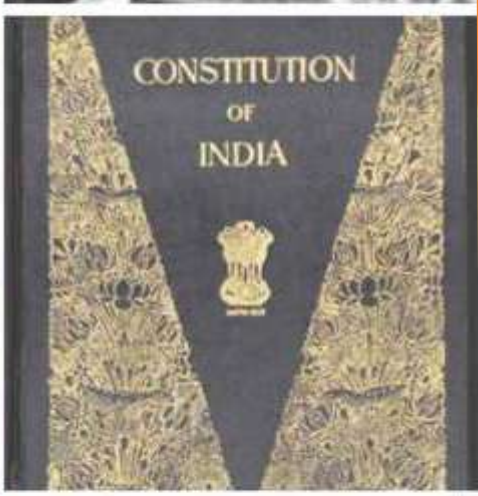

নয়াদিল্লিতে বিজেপি কেন্দ্রীয় অফিসে প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী, ভারতরত্ন শ্রদ্ধেয় অটল বিহারী বাজপেয়ী-জির জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে চিত্র প্রদর্শনীতে বিজেপি সর্বভারতীয় সভাপতি শ্রী জেপি নাড্ডা।

জম্মু ও কাশ্মীরের সাংস্কৃতিক, আধ্যাত্মিক ও ঐতিহাসিক ঐতিহ্য নিয়ে নয়াদিল্লিতে তথ্যসমৃদ্ধ বইয়ের উন্মোচন করলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী শ্রী অমিত শাহ। প্রকাশকঃ আইসিএইচআর এবং এনবিটি।

ওড়িশার ভুবনেশ্বরে ১৮তম প্রবাসী ভারতীয় দিবস সম্মেলনের উদ্বোধন উপলক্ষে আয়োজিত প্রদর্শনীতে প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী, বিদেশমন্ত্রী শ্রী এস জয়শঙ্কর এবং ওড়িশার মুখ্যমন্ত্রী শ্রী মোহন চরণ মাঝি।

বিধানসভা নির্বাচনের প্রাক্কালে দিল্লি প্রদেশ বিজেপি অফিসে দলীয় কর্মকর্তাদের নিয়ে 'ইলেকশন কন্ডাক্ট কমিটির' সভায় বিজেপি সর্বভারতীয় সভাপতি শ্রী জেপি নাড্ডা।

শ্রদ্ধেয় মুরলী মনোহর যোশি জী-র জন্মদিনে তাঁর বাসভবনে শ্রদ্ধা জানাতে বিজেপি নেতা শ্রী রাজনাথ সিং এবং শ্রী অমিত শাহের সঙ্গে বিজেপি সর্বভারতীয় সভাপতি শ্রী জেপি নাড্ডা।

বঙ্গ
কমলবার্তা
জানুয়ারি সংখ্যা। ২০২৫

জন্মশতবর্ষে অটল বিহারী বাজপেয়ী ৪

পঞ্চতীর্থ থেকে সমতা প্রতিষ্ঠা: ডঃ আম্বেদকরের অবদানকে দেশের প্রতিটি মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে চায় বিজেপি ৬

'আধা কোটি' পার বঙ্গ বিজেপি পরিবার ১৪
শুভ্র চট্টোপাধ্যায়

ছবিতে খবর ১৬

বাবাসাহেবের দূরদৃষ্টি সংবিধানের রক্ষাকবচ ২২
নারায়ণ চক্রবর্তী

আম্বেদকরকে নিয়ে কংগ্রেসের অভিনয় ২৫
পুলক নারায়ণ ধর

কমিউনিজম এবং ডঃ আম্বেদকর ২৮
দেবতনু ভট্টাচার্য্য

ডঃ ভীমরাও আম্বেদকর ও তাঁর পাকিস্তান ভাবনা ৩১
বিনয়ভূষণ দাশ

সম্পাদক: জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায়
কার্যনির্বাহী সম্পাদক : অয়ন বন্দ্যোপাধ্যায়
সহযোগী সম্পাদক : জয়ন্ত গুহ
সম্পাদকমন্ডলী:
অভিরূপ ঘোষ, কৌশিক কর্মকার, সৌভিক দত্ত, অনিকেত মহাপাত্র
সার্কুলেশন: সঞ্জয় শর্মা

সম্পাদকীয়

গান্ধী পরিবারের কংগ্রেস পার্টি। আর সেই পরিবারের সব্বাই এখন সংসদে। আর পার্টি? ভুষো কালি মাখা হারিকেন বাতির মত টিমটিম করে জ্বলছে, স্বাধীনতার পর থেকে যারা সংবিধানকে দেশের মানুষের কাছ থেকে দূরে সরিয়ে নিজেদের পকেটে পুরে রেখেছিল। সংবিধান তাদের হৃদয়ে নেই, চেতনায় নেই- এখনও পকেটেই পুরে রাখতে চায়। পকেটে পুরে রাখতে চায় দেশের জনগণের সাংবিধানিক অধিকার।

"সংবিধান সংসদে গৃহীত হওয়ার পর ৭৫ বছরে ৫৫ বছরই রাজত্ব করেছে একটা পরিবার। সংবিধানকে আক্রমণ করতে কোনও সুযোগ ছাড়েনি কংগ্রেসের একটি পরিবার। কংগ্রেস এতটাই রক্তপিপাসু ছিল যে, সংবিধানের আত্মাকে বার বার রক্তাক্ত করতে থাকে ··· সংবিধানের ২৫ বছর পূর্তিতে ভারতীয় সংবিধান ছিঁড়ে ফেলা হয়েছিল। জরুরি অবস্থা জারি করে জনগণের সমস্ত সাংবিধানিক অধিকার কেড়ে নেওয়া হয়েছিল। গোটা দেশকে জেলখানায় পরিণত করেছিলেন ইন্দিরা গান্ধী। ··· প্রথম প্রধানমন্ত্রী এক সময় সমস্ত কংগ্রেস মুখ্যমন্ত্রীকে চিঠি লিখে বলেছিলেন, সংবিধান যদি বাধা সৃষ্টি করে, তবে তা পরিবর্তন করা উচিত। সংবিধান পরিবর্তনে নেহরু যে বীজ বপন করেছিলেন, ইন্দিরা গান্ধী তা অনুসরণ করেছিলেন। রক্তের স্বাদ পেয়ে সংবিধানের অপব্যবহার করে জরুরি অবস্থা জারি করেছিলেন তিনি। দেশের বিচারব্যবস্থার উপর আধিপত্য বিস্তারের জন্য সাংবিধানিক সংশোধনী করে আদালতের ডানা কেটেছিলেন। পরবর্তী সময়ে রাজীব গান্ধীও সংবিধানকে আক্রমণ শানিয়ে গিয়েছেন। তিনি ভোটব্যাঙ্কের স্বার্থে সুপ্রিম কোর্টের দেওয়া শাহ বানো মামলার রায় মানতে অস্বীকার করেছিলেন," সংসদে সংবিধান নিয়ে আলোচনায় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী যা বলেছেন তা কি অস্বীকার করতে পারবে কংগ্রেস?

দেশের স্বার্থে নয়, একটি পরিবারের স্বার্থে-ক্ষমতায় টিকে থাকার স্বার্থে কংগ্রেস সরকার তার ৬০ বছর মেয়াদকালে ৭৫ বার সংবিধান পরিবর্তন করেছে। শুধু সংবিধানের ওপর আক্রমণ নয়, কংগ্রেস সংবিধান প্রণেতা বাবাসাহেব আম্বেদকর এবং সংরক্ষণ ব্যবস্থারও বিরোধিতা করেছে। বাবাসাহেবকে যথাযথ সম্মান দিতে ব্যর্থ কংগ্রেস।

কেন নেহরু-ইন্দিরার জমানায় ভারতরত্ন দেওয়া হয়নি বাবাসাহেবকে? কেন নেহরু মন্ত্রীসভা থেকে সরে যেতে হয়েছিল বাবাসাহেবকে? তফসিলি জাতি ও উপজাতি সম্প্রদায়কে অপমান-অবহেলা করে কেন কংগ্রেস শাসনে ধর্মের ভিত্তিতে সংরক্ষণ দেওয়া হয়েছিল? কেন অম্বেডকরকে নির্বাচনে পরাজিত করতে জওহরলাল নেহরু তাঁর বিরুদ্ধে প্ররোচনা করেছিলেন? কেন সংসদে সেন্ট্রাল হলে অম্বেডকরের প্রতিকৃতি বসাতে বাধা দিয়েছিল কংগ্রেস?

এর জবাব তো শুধু কংগ্রেস নয়। দিতে হবে কংগ্রেসের 'মুখোশ', কংগ্রেসের জোটসঙ্গী (একবার নয়, বারবার), কখনও বা ছায়াসঙ্গী তৃণমূল কংগ্রেস এবং কংগ্রেসের 'পরম মিত্র' সিপিএমকেও। সংবিধানের ৭৫ বছরে সংবিধান এবং বাবাসাহেবকে নিয়ে কংগ্রেসের কুকীর্তির দায় কি তারা ঝেড়ে ফেলতে পারে?

জন্মশতবর্ষে অটল বিহারী বাজপেয়ী

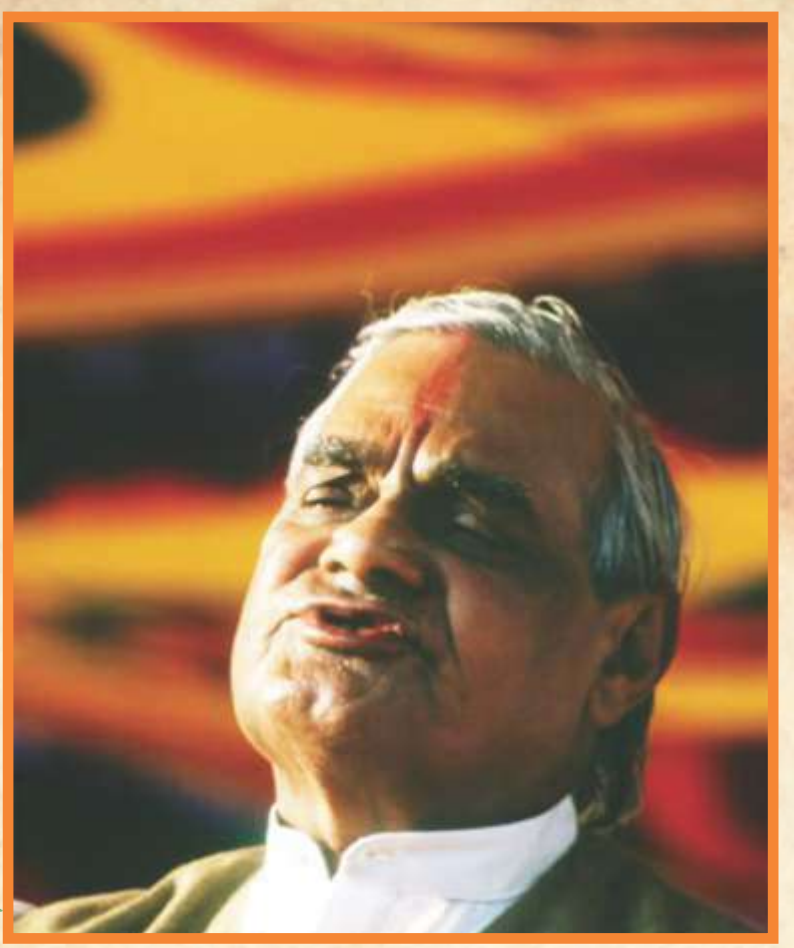

১৯২৪ সালের ২৫ ডিসেম্বর গোয়ালিয়রে জন্ম অটলবিহারী বাজপেয়ীর। মা কৃষ্ণা দেবী, বাবা কৃষ্ণবিহারী বাজপেয়ী। বাবা ছিলেন কবি, পেশায় স্কুলশিক্ষক। কবিতায় হাতেখড়ি বাবার কাছেই। গোয়ালিয়রে ভিক্টোরিয়া কলেজ থেকে স্নাতক হন। পরে কানপুরের ডিএভি কলেজ থেকে স্নাতকোত্তরে উত্তীর্ণ হন প্রথম শ্রেণিতে। ইংরেজি, হিন্দি, সংস্কৃত— তরুণ বয়সেই তিনটি ভাষায় পারদর্শী হয়ে উঠেছিলেন বাজপেয়ী।

ছাত্রাবস্থাতেই 'আর্যসমাজ' -এর সঙ্গে যুক্ত হন। বাবাসাহেব আপ্তে-র অনুপ্রেরণায় ১৯৩৯ সালে যোগ দেন আরএসএসে। কয়েক বছরের মধ্যেই হয়ে ওঠেন সঙ্ঘের প্রচারক। দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামেও যোগ দিয়েছিলেন অটলবিহারী। 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলনে অংশ নিয়ে গ্রেফতার হয়েছিলেন। জেল খেটেছিলেন ২৩ দিন।

১৯৫১ সালে দীনদয়াল উপাধ্যায়ের অনুপ্রেরণায় অটল বিহারী যোগ দেন ভারতীয় জনসঙ্ঘে। দলের প্রতিষ্ঠাতা শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের অন্যতম প্রিয়পাত্রও হয়ে ওঠেন শীঘ্রই। ১৯৫৭ সালে উত্তরপ্রদেশের বলরামপুর থেকে বাজপেয়ী প্রথম বার লোকসভায় নির্বাচিত হন। ১৯৬৮ সালে ভারতীয় জনসঙ্ঘের সর্বভারতীয় সভাপতি হন। ১৯৭৭ সালে জরুরি অবস্থার অবসান। ইন্দিরা-বিরোধী ঐক্য জোরদার করতে চরণ সিংহের নেতৃত্বাধীন ভারতীয় লোক দল এবং মোরারজি দেশাইদের কংগ্রেস (ও) এবং বাজপেয়ী-আডবাণীদের জনসঙ্ঘ মিশে যায়, তৈরি হয় জনতা পার্টি। ১৯৮০ সালে সাবেক জনসঙ্ঘীরা বেরিয়ে যান জনতা পার্টি থেকে। তৈরি হয় ভারতীয় জনতা পার্টি (বিজেপি), যার প্রথম সভাপতি হন বাজপেয়ী।

“বাজপেয়ীর উপপ্রধান হিসেবে তাঁর সঙ্গে ছ'বছর কাজ করেছি। বুঝেছি নেতা হতে গেলে কী কী গুণ থাকা প্রয়োজন। কী অসাধারণ বাগ্মী ছিলেন তিনি। আমি চেষ্টা করেও ওঁর মতো বাগ্মী হতে পারিনি। প্রতিপক্ষের মন জয় করার এক অসাধারণ ক্ষমতা ছিল তাঁর। মতাদর্শগত পার্থক্য থাকলেও সেটিকে তিনি কখনওই বড় করে দেখেননি। বরং সব সময় চেষ্টা করেছেন, যাতে সেই মতপার্থক্য ঘুচিয়ে নেওয়া সম্ভব হয়। অনেকে জানেন না অটলজির একটি অদ্ভুত গুণ ছিল। আমি যদি কোনও প্রস্তাব দিতাম তা হলে তিনি কোনও দিনই তাতে 'না' বলতেন না। আর 'না' বলতেন না বলেই আমার উপর চাপ বেড়ে গিয়েছিল। কোনও কিছু বলার আগে বারবার ভাবতাম— এটা আমার বলা ঠিক হচ্ছে তো!”

— লালকৃষ্ণ আডবাণী

পঞ্চতীর্থ থেকে সমতা প্রতিষ্ঠা

ডঃ আম্বেদকরের অবদানকে দেশের প্রতিটি মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে চায় বিজেপি

প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে বিজেপি সরকার ডঃ ভীমরাও রামজি আম্বেদকরের অবদান এবং ঐতিহ্যকে সম্মান জানাতে একাধিক উদ্যোগ নিয়েছে। এই উদ্যোগগুলির লক্ষ্য তাঁর ঐতিহ্যের সংরক্ষণ, শিক্ষার প্রচার এবং সামাজিক ন্যায় ও সমতার প্রতি অবদানকে তুলে ধরা।

ডঃ আম্বেদকরের সভাপতিত্বে সংবিধান খসড়া কমিটি (২৯ অগাস্ট, ১৯৪৭)

পঞ্চতীর্থের উন্নয়নে বিজেপি সরকারের ভূমিকা

বিজেপি সরকার ডঃ আম্বেদকরের জীবনের সঙ্গে সম্পর্কিত পাঁচটি গুরুত্বপূর্ণ স্থানকে "পঞ্চতীর্থ" নামে চিহ্নিত করেছে এবং সেগুলিকে ঐতিহাসিক ও সাংস্কৃতিক তাৎপর্যের স্থান হিসাবে সংস্কার করেছে—

জন্মভূমি (মহু, মধ্যপ্রদেশ): ডঃ আম্বেদকরের জন্মস্থান, এখানে একটি স্মৃতিস্তম্ভ গড়ে তোলা হয়েছে।

শিক্ষাভূমি (লন্ডন): যেখানে তিনি উচ্চশিক্ষা লাভ করেছিলেন।

দীক্ষাভূমি (নাগপুর): যেখানে তিনি বৌদ্ধ ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন।

মহাপরিনির্বাণ ভূমি (দিল্লি): যেখানে তাঁর শেষকৃত্য সম্পন্ন করা হয়।

চৈত্য ভূমি (মুম্বই): তাঁর চিরনিদ্রার স্থান, যা একটি পবিত্র স্মৃতিস্তম্ভ হিসাবে প্রতিষ্ঠিত।

ডঃ আম্বেদকরের প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে মোদীজির ভিম অ্যাপ

প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী ডঃ ভীমরাও রামজি আম্বেদকরের নামে ভিম অ্যাপ চালু করেন। এই অ্যাপটি ইউনিফায়েড পেমেন্টস ইন্টারফেস (UPI)-এর উপর ভিত্তি করে তৈরি। এই অ্যাপ সরাসরি ব্যাঙ্কের মাধ্যমে ই-পেমেন্টকে আরও সহজতর করে ক্ষুদ্র ও মাঝারি ব্যবসায়ী, কৃষক এবং আর্থিকভাবে দুর্বল শ্রেণির ক্ষমতায়ন ঘটিয়েছে।

ডঃ আম্বেদকর স্মরণে ডাকটিকিট প্রকাশ

২০১৫ সালের ৩০ সেপ্টেম্বর, তথ্য-প্রযুক্তি মন্ত্রী এবং সমাজকল্যাণ মন্ত্রীর উপস্থিতিতে ডঃ বি.আর.আম্বেদকরের স্মরণে একটি স্মারক ডাকটিকিট প্রকাশ করা হয়।

প্রজাতন্ত্র দিবসের কুচকাওয়াজে ডঃ আম্বেদকরের ট্যাবলো

২০১৬ সালের ২৬ জানুয়ারি রাজপথে অনুষ্ঠিত প্রজাতন্ত্র দিবসের কুচকাওয়াজে সমাজকল্যাণ মন্ত্রকের পক্ষ থেকে ডঃ বি.আর. আম্বেদকরের উপর একটি ট্যাবলো প্রদর্শিত হয়েছিল।

বিজেপি সরকারের উদ্যোগেই ডঃ আম্বেদকরের মূর্তি স্থাপন

মোদী সরকার ডঃ বি.আর.আম্বেদকরের মূর্তি দেশের শীর্ষ আদালত এবং আইন মন্ত্রকে স্থাপন করেছে, যাতে তাঁর অবদান স্মরণীয় হয়ে থাকে এবং ভারতের আইনি পরিকাঠামো তৈরিতে তাঁর ভূমিকা সম্পর্কে জনগণ সচেতন হয়।

১৯৯০ সালের ১২ এপ্রিল, প্রয়াত শ্রী অটল বিহারী বাজপেয়ী, ডঃ আম্বেদকরের একটি প্রতিকৃতি সংসদের কেন্দ্রীয় হলে স্থাপন করেন। এই প্রতিকৃতিটি এঁকেছিলেন জেবা আমরোহাভি এবং উন্মোচন করেছিলেন তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী শ্রী ভি.পি.সিং। উল্লেখযোগ্যভাবে, বিজেপি ভি.পি.সিং সরকারকে সমর্থন করেছিল।

ডঃ আম্বেদকরের অবদানকে দেশজুড়ে ছড়িয়ে দিতে নরেন্দ্র মোদী সরকারের 'সংবিধান দিবস' উদযাপন

ভারতের সংবিধান ১৯৪৯ সালের ২৬ নভেম্বর ভারতের গণপরিষদে গৃহীত হয়েছিল এবং ১৯৫০ সালের ২৬ জানুয়ারি কার্যকর হয়েছিল। স্বাধীনতার পর দীর্ঘ সময় কংগ্রেস শাসনকালে, ২৬ নভেম্বর দিনটি মূলত ডঃ বি.আর. আম্বেদকরের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদনকারী ব্যক্তি ও সংগঠনগুলিই পালন করত। ২০১৫ সালে বি.আর. আম্বেদকরের ১২৫তম জন্মবার্ষিকীতে, প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র

মোদীর নেতৃত্বে বিজেপি সরকার প্রথম ২৬ নভেম্বর দিনটিকে সংবিধান দিবস হিসাবে ঘোষণা করে। ভারতের গণপরিষদ কর্তৃক সংবিধান গৃহীত হওয়ার স্মরণে এই দিনটিকে সংবিধান দিবস হিসাবে মনোনীত করার ঐতিহাসিক পদক্ষেপ গ্রহণ করে।

পাশাপাশি ২০১০ সালে ভারতের সংবিধানের ৬০ বছর পূর্তি উপলক্ষে, তৎকালীন গুজরাতের মুখ্যমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী একটি বিশেষ এবং প্রতীকী "সংবিধান গৌরব যাত্রা" আয়োজন করেন। এই অনুষ্ঠানের অংশ হিসেবে, ভারতের সংবিধানের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করতে সংবিধানের একটি কপি অত্যন্ত সম্মানের সঙ্গে একটি হাতির মাথায় রেখে শহর জুড়ে শোভাযাত্রা করা হয়েছিল।

২০১৫ সালের আগে, ২৬ নভেম্বর 'আইন দিবস' হিসেবে পালিত হত, যা মূলত বিচারালয় ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পরিচিত ছিল। আজ, পুরো দেশ গর্বের সঙ্গে আমাদের সংবিধানকে সম্মান করে, ডঃ আম্বেদকরের অবদানের প্রতি শ্রদ্ধা জানায়।

সংবিধান গ্রহণের বার্ষিকী উদযাপন

২৫ তম বার্ষিকী: জরুরি অবস্থার সময়, সংবিধানিক অধিকার, সংবাদমাধ্যমের বাকস্বাধীনতা খর্ব করা হয়েছিল এবং গণতন্ত্রের কণ্ঠ রোধ করা হয়েছিল। কংগ্রেস দলের ইতিহাসে যা একটি কালো অধ্যায়।

৫০ তম বার্ষিকী: ২০০০ সালের ২৬ নভেম্বর, প্রধানমন্ত্রী শ্রী অটল বিহারী বাজপেয়ীর নেতৃত্বে একতা, জনসম্পৃক্তি এবং সহযোগিতার বার্তা দিয়ে এই দিনটি উদযাপন করা হয়েছিল, যা সংবিধানকে পুনঃস্থাপিত করে।

৬০ তম বার্ষিকী: গুজরাতে শ্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে প্রবল উন্মাদনার সঙ্গে এই দিনটি উদযাপিত করা হয়েছিল। সংবিধানকে সম্মান জানাতে 'সংবিধান গৌরব যাত্রা' নামে একটি শোভাযাত্রা আয়োজন করা হয়।

৭৫ তম বার্ষিকী: প্রধানমন্ত্রী মোদীর নেতৃত্বে ভারতের সংবিধান গ্রহণের ঐতিহাসিক ৭৫ বছর উপলক্ষে বছরব্যাপী অনুষ্ঠান পালিত হচ্ছে। এই অনুষ্ঠানটি "আমাদের সংবিধান, আমাদের স্বাভিমান" প্রচারের মাধ্যমে উদযাপিত হচ্ছে, যার উদ্দেশ্য সংবিধানের রচয়িতার অবদানকে সম্মান জানানো এবং সংবিধানের প্রধান মূল্যবোধগুলোকে পুনঃপ্রকাশ করা।

মুম্বইয়ে "সমতার মূর্তি"

ডঃ আম্বেদকরের দেওয়া শিক্ষা ও ঐতিহ্যকে সম্মান জানাতে মুম্বইয়ে "সমতার মূর্তি" নির্মাণ করা হচ্ছে। ২০২৪ সালের ডিসেম্বরের মধ্যে নির্মাণকাজের ৪৭% সম্পন্ন হয়েছে।

লন্ডনে ডঃ আম্বেদকরের বাড়ির সংরক্ষণ

লন্ডনে স্কুল অফ ইকোনমিক্সে পড়ার সময় ডঃ আম্বেদকর যেখানে থাকতেন, সেই বাড়িটি বিজেপি সরকার কিনে নিয়েছে। এটি একটি স্মৃতিসৌধ এবং সাংস্কৃতিক কেন্দ্র হিসাবে সংস্কার করা হয়েছে, যা সারা বিশ্বের মানুষকে অনুপ্রাণিত করবে।

ডঃ আম্বেদকর আন্তর্জাতিক কেন্দ্র, নয়াদিল্লি

এই কেন্দ্রটি স্থাপনের প্রস্তাব দেওয়া হয় প্রধানমন্ত্রী শ্রী চন্দ্রশেখরের আমলে। কিন্তু পরবর্তীতে কংগ্রেস সরকারের শাসনে এই প্রস্তাবের কোনও অগ্রগতি হয়নি। প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে ২০১৫ সালের ২০ এপ্রিল ডঃ আম্বেদকরের ১২৫তম জন্মবার্ষিকী উদযাপনকালে এই কেন্দ্রের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করা হয়। এটি ২০১৭ সালের ৭ ডিসেম্বর উদ্বোধন করা হয়। আর্থ-সামাজিক রূপান্তরের ক্ষেত্রে অধ্যয়ন, গবেষণা, বিশ্লেষণ ও নীতি প্রণয়নের জন্য দিল্লির জনপথে এই কেন্দ্র স্থাপনের পরিকল্পনা করেছিলেন মোদীজি। এই কেন্দ্রের মূল লক্ষ্য সুষ্ঠু ও প্রামাণিক গবেষণার মাধ্যমে সামাজিক-রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক বৈষম্য হ্রাস করা।

ডঃ আম্বেদকরের রচনাবলীর ডিজিটাইজেশন

অনেক বেশি সংখ্যক শ্রোতাদের কাজে পৌঁছে দিতে ডঃ আম্বেদকরের লেখাগুলি এবং বক্তৃতাগুলি ডিজিটাইজেশন ও প্রকাশের উদ্যোগ নিয়েছে কেন্দ্রীয় সরকার।

সংবিধানের প্রতি সম্মান: সংবিধান সংশোধনী

কংগ্রেস ৭৫ বার সংবিধান সংশোধন করেছে। ১৯৪৭ থেকে ১৯৫২ পর্যন্ত একটি অন্তর্বর্তী সরকারের শাসনকালে সংবিধান সংশোধন করা হয়। সংবিধানের এই সংশোধন ছিল জনমতের বিরোধী এবং মত প্রকাশের স্বাধীনতার উপর তা চরম আঘাত আনে। ২০১৪ সালে প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে বিজেপি ক্ষমতায় আসার পর থেকে, ভারতীয় সংবিধান মাত্র আটবার সংশোধিত হয়েছে। উল্লেখযোগ্যভাবে, সমস্ত সংশোধনগুলি বিরোধী দলের সমর্থন নিয়ে পাশ হয়েছে, যা শাসন ব্যবস্থার এক ঐক্যমূলক দৃষ্টিভঙ্গি প্রতিফলিত করে।

বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ সংশোধন

পণ্য ও পরিষেবা কর (GST) ২০১৭ সালে চালু করা হয়।

২০১৯ সালে সর্বভারতীয় তফসিলি কমিশনকে (NCBC) সাংবিধানিক মর্যাদা দেওয়া হয়েছে।

অর্থনৈতিকভাবে দুর্বল শ্রেণির জন্যে (EWS) সংরক্ষণ ব্যবস্থা ২০১৯ সালে চালু করা হয়।

২০১৯ সালে সংবিধানের অর্থ কমিশন এবং ষষ্ঠ তফসিল সম্পর্কিত বিধানগুলির সংশোধন।

লোকসভা ও বিধানসভায় তফসিলিজাতি ও উপজাতি সংরক্ষণের মেয়াদ বাড়ানো হয় ২০১৯ সালে।

রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলিকে তাদের নিজস্ব অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণির তালিকা পরিবর্তনের ক্ষমতা প্রদান করা হয় ২০২১ সালে।

২০২৩ সালে মহিলা সংরক্ষণ বিল প্রণয়ন।

২০১৪-এর পর থেকে সামাজিক ন্যায়বিচার প্রসার করতে নেওয়া উদ্যোগ

NEET-এ অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণির সংরক্ষণ: চিকিৎসা নিয়ে পড়াশোনার ক্ষেত্রে অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণির শিক্ষার্থীদের সুযোগ বৃদ্ধি নিশ্চিত করা হয়েছে।

সর্বভারতীয় তফসিলি কমিশনকে সাংবিধানিক মর্যাদা: তফসিলি সম্প্রদায়ের সমস্যাগুলি সমাধানের ক্ষমতাকে বৃদ্ধি করা হয়েছে।

নবোদয় বিদ্যালয়ে অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণির সংরক্ষণ: নবোদয় বিদ্যালয়ে অনগ্রসর শ্রেণির শিক্ষার্থীদের জন্য শিক্ষার অধিকার ও শিক্ষার মান সুনিশ্চিত করা।

তফসিলি ফেডারেশনের মহিলা প্রতিনিধিদের সঙ্গে ডঃ আম্বেদকর

কেন্দ্রীয় মন্ত্রী পরিষদে ২৭ জন অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণির মন্ত্রীদের অন্তর্ভুক্তি: এটি পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর আশা-আকাঙ্খার কথা বলে এবং প্রতিটি জাতি-উপজাতির প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করতে সরকারের প্রতিশ্রুতি প্রতিফলিত করে।

আর্থিকভাবে দুর্বল শ্রেণি (EWS) সংরক্ষণ: আর্থিকভাবে অনগ্রসর শ্রেণির জন্য শিক্ষা ও সরকারি চাকরিতে ১০% সংরক্ষণ প্রদান করা। যা ভারতে সাম্যের সাংবিধানিক কাঠামো বজায় রেখে উন্নয়ন এবং সামাজিক ন্যায়বিচারের অন্যতম উদাহরণ।

দেশের শীর্ষ আদালতে সর্বপ্রথম তিনজন দলিত বিচারপতি নিয়োগ: সর্বোচ্চ আদালতে প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর মানুষকে প্রতিনিধিত্ব করার সুযোগ দেওয়া হয়েছে যা অন্যতম ঐতিহাসিক পদক্ষেপ।

অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণির (OBC) জন্য কেন্দ্রীয় গবেষণা ফেলোশিপ (RGNF): অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণির পড়ুয়াদের কেন্দ্রীয় গবেষণা ফেলোশিপ প্রদান করা যা তাঁদের উচ্চ শিক্ষা এবং গবেষণায় উৎসাহিত করে।

মনোনীত বিভাগের অধীনে রাজ্যসভায় একজন দলিতের মনোনয়ন: সর্বপ্রথম একজন দলিত শিল্পী, মায়েস্ট্রো ইলাইয়ারাজাকে রাজ্যসভায় মনোনীত হয়েছেন। সঙ্গীত জগতে তাঁর অপরিসীম অবদানকে স্বীকৃতি দিয়ে শিল্পজগতে প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর মানুষের কৃতিত্বের কথা তুলে ধরা হয়েছে।

৩৭০ অনুচ্ছেদের বিলোপ

২০১৯ সালে ৩৭০ অনুচ্ছেদের বিলোপ জম্মু ও কাশ্মীরকে ভারতের সংবিধানের সঙ্গে সম্পূর্ণভাবে সংযুক্ত করার একটি ঐতিহাসিক পদক্ষেপ। এই সিদ্ধান্তের আগে, ভারতের সংবিধানের অনেক ধারা জম্মু ও কাশ্মীরে কার্যকর ছিল না, ফলে বেশ কিছু বৈষম্য ও অবিচারের শিকার হতেন এখানকার বাসিন্দারা।

৩৭০ অনুচ্ছেদের অধীনে, দেশভাগের সময়কার হাজার হাজার হিন্দু ও শিখ শরণার্থী ভোটাধিকার এবং স্থায়ী বাসিন্দার মর্যাদা থেকে বঞ্চিত হয়েছিলেন। রাজ্যে সংখ্যালঘুরা অনেক অধিকার থেকে বঞ্চিত ছিল এবং সামাজিক ন্যায়বিচারের নীতি, যেমন-সংরক্ষণ, কার্যকর করেনি সেই সময় ক্ষমতায় থাকা সরকার। বিশেষত, দলিত সম্প্রদায়ের মানুষ স্থায়ী বাসিন্দার শংসাপত্র পেতেন না এবং তাঁদের যোগ্যতা সত্ত্বেও শুধুমাত্র ঝাড়ুদারের মতো সরকারি চাকরিতে সীমাবদ্ধ রাখা হত।

২০১৯ সালের পর থেকে হওয়া পরিবর্তনগুলি নারীদের সম্পত্তির সমান অধিকার নিশ্চিত করেছে এবং জনজাতি সম্প্রদায়গুলি সংরক্ষণ ও সামাজিক কল্যাণমূলক প্রকল্পের সুবিধা পেয়েছে। এই সংযুক্তি জম্মু ও কাশ্মীরের মানুষদের জন্য বহু প্রতীক্ষিত সমতা ও ন্যায়বিচার নিয়ে এসেছে এবং এটি ভারতের সংবিধানের নীতিমালারগুলির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

কেন্দ্রীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষক নিয়োগ সংরক্ষণ বিল ২০১৯

এই অধ্যাদেশটি ২০০ পয়েন্ট রোস্টার সিস্টেম পুনঃস্থাপন করেছে, যা বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজে নিয়োগ প্রক্রিয়ায় সংরক্ষণ নীতির বাস্তবায়ন নিশ্চিত করেছে। এই বিলটি পাস হওয়া একটি ঐতিহাসিক পদক্ষেপ, যা দীর্ঘদিনের অবহেলার অবসান ঘটিয়েছে।

বহু বছর ধরে, পূর্ববর্তী কংগ্রেস সরকারের আমলে বামপন্থা প্রভাবিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতে সংরক্ষণ নীতিগুলি কার্যকর না করার জন্য নানা কারসাজি করা হতো। এর একটি উল্লেখযোগ্য উদাহরণ দেখা যায় ১৯৯৭ সালে। যখন ১৯৯৫ সালের সাবরওয়াল রায়ের বিরোধিতা করে হাজার হাজার সংরক্ষিত আসন রাতারাতি অসংরক্ষিত আসনে রূপান্তরিত করা হয়। রায়ে উল্লেখ ছিল, শূন্যপদের ভিত্তিতে সংরক্ষণ পদ্ধতির পরিবর্তে পদভিত্তিক সংরক্ষণ ব্যবস্থা কার্যকর হবে, তবে পুরনো পদ্ধতি অব্যাহত থাকবে যতক্ষণ না সমস্ত সংরক্ষিত পদ পূরণ হয়। কিন্তু এই নির্দেশ উপেক্ষা করা হয়, যার ফলে প্রান্তিক সম্প্রদায়গুলিকে ন্যায্য সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়।

মোদী সরকার ২০১৯ সালে এই দীর্ঘস্থায়ী অনিয়ম বন্ধ করে ২০০ পয়েন্ট রোস্টার সিস্টেম পুনরায় চালু করে। এর ফলে তফসিলি, জনজাতি, অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণি এবং অর্থনৈতিকভাবে দুর্বল

শ্রেণির হাজার হাজার শিক্ষক বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজে নিয়োগ পেয়েছেন, যা এই গোষ্ঠীগুলির জন্য বহু প্রতীক্ষিত ন্যায়বিচার নিশ্চিত করেছে।

নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন ২০১৯

নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন (সিএএ) ২০১৯ প্রণীত হয় পাকিস্তান, বাংলাদেশ এবং আফগানিস্তানে ধর্মীয় নিপীড়নের শিকার অমুসলিম ব্যক্তিদের, হিন্দু, শিখ, বৌদ্ধ, জৈন, পার্সি এবং খ্রিস্টানদের ভারতের নাগরিকত্ব প্রদানের জন্য। এই আইনের মাধ্যমে নাগরিকত্ব পাওয়া মানুষের মধ্যে অধিকাংশই দলিত এবং উপজাতি সম্প্রদায়ের।

পশ্চিমবঙ্গে, বিখ্যাত দলিত নেতা যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডল "ভীম-মিম" রাজনৈতিক সমন্বয়ের মাধ্যমে দলিত-মুসলমান ঐক্যের ধারণাকে সমর্থন করেছিলেন। এর ফলে, অনেক দলিত, বিশেষ করে নমশূদ্র ও মতুয়া সম্প্রদায়, তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে (বর্তমানে বাংলাদেশ) থেকে গিয়েছিলেন।

যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডল পাকিস্তানের প্রথম আইন ও শ্রমমন্ত্রী ছিলেন। কিন্তু পাকিস্তানে হিন্দু ও শিখ সম্প্রদায়ের ওপর নির্যাতন বেড়ে গেলে এবং পূর্ব পাকিস্তানে দলিতদের ওপর নিপীড়ন তীব্র হলে তিনি ভারত ফিরে আসেন। এর পর থেকেই পূর্ব পাকিস্তান থেকে হিন্দুদের, বিশেষত নমশূদ্র ও মতুয়া দলিতদের, বড় সংখ্যায় ভারতে অভিবাসন শুরু হয়। প্রায় ৭০ বছর কংগ্রেস সরকার ভারতের ক্ষমতায় থাকলেও এই নিপীড়িত অভিবাসীদের নাগরিকত্ব প্রদানের জন্য উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ নেয়নি।

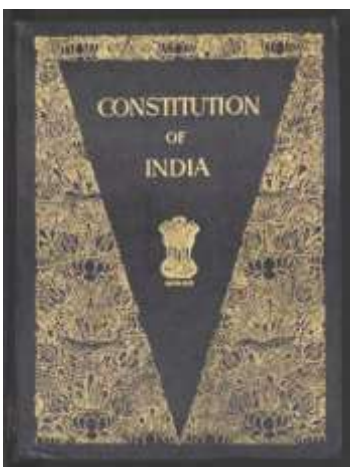

তফসিলি জাতি ও উপজাতি (নিগ্রহ প্রতিরোধ) আইন ১৯৮৯ (২০১৬ সালে সংশোধিত)

তফসিলিজাতি ও তফসিলিউপজাতি (নিগ্রহ প্রতিরোধ) আইনটি প্রথমে কংগ্রেস সরকারের অধীনে ১৯৮৯ সালে চালু হয়। তবে, এই আইনে দলিত ও জনজাতিদের বিরুদ্ধে অনেক গুরুতর অপরাধের জন্য প্রয়োজনীয় ধারা ছিল না। ২০১৪ সালে প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পর, নরেন্দ্র মোদীজি দলিতদের উন্নয়ন ও তাদের নিপীড়ন থেকে মুক্তি দেওয়ার জন্য বড় পদক্ষেপ নেন। ২০১৫ সালে এই আইনে উল্লেখযোগ্য সংশোধন আনা হয়, যা ২০১৬ সালের ১ জানুয়ারি থেকে কার্যকর হয়। এতে অনেক গুরুত্বপূর্ণ ধারা যুক্ত করা হয় যা আগের আইনে উপেক্ষিত ছিল।

তফসিলি জাতি/উপজাতি নিগ্রহ প্রতিরোধ বিধি ১৯৯৫ (২০১৬ সালে সংশোধিত)

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বাধীন বিজেপি সরকার দলিত ও জনজাতিদের নিপীড়ন থেকে সুরক্ষা দিতে এবং ক্ষতিগ্রস্তদের আর্থিক সহায়তা প্রদানে উল্লেখযোগ্য সংস্কার এনেছে। এই সংশোধনগুলি ২০১৬ সালের ১৪ জুন থেকে কার্যকর হয় এবং সমাজের পিছিয়ে পড়া মানুষদের আইনি সুরক্ষা আরও শক্তিশালী হয়।

কংগ্রেস সরকারের তুলনায় বিজেপি সরকার ক্ষতিগ্রস্ত দলিত/জনজাতি পরিবারগুলিকে ৪-৫ গুণ বেশি আর্থিক সহায়তা প্রদান করেছে। খুন, গণহত্যা, ধর্ষণ, গণধর্ষণ শিকার যারা হয়েছে এবং যারা স্থায়ীভাবে অক্ষম, সেই পরিবারগুলি পেনশনের সুবিধা পেয়েছে, যা তাদের দীর্ঘমেয়াদি আর্থিক স্থিতিশীলতা নিশ্চিত করেছে।

ভারতীয় ন্যায় সংহিতা (BNS)

প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে বিজেপি সরকার ভারতের আইন ব্যবস্থায় এক ঐতিহাসিক সংস্কার চালু করেছে, যেখানে ১৬০ বছর পুরোনো ঔপনিবেশিক ভারতীয় দণ্ডবিধি বা ইন্ডিয়ান পেনাল কোডকে পরিবর্তন করে ইন্ডিয়ান জাস্টিস কোড চালু করা হয়েছে। সম্প্রতি ভারতীয় ন্যায় সংহিতা (BNS), ভারতীয় নাগরিক সুরক্ষা সংহিতা (BNSS) এবং ভারতীয় সাক্ষ্য অধিনিয়ম (BSA) আইন বলবৎ করা হয়েছে। যা ভারতীয় আইন ব্যবস্থাকে ঔপনিবেশিক প্রভাব থেকে মুক্ত করার দিকে একটি বড় পদক্ষেপ হিসেবে কাজ করেছে।

ঔপনিবেশিক আইনি ব্যবস্থা নিপীড়ন প্রথাকে সমর্থন করে। যেমন ১৮৭১ সালের ক্রিমিনাল ট্রাইবস অ্যাক্ট, যা দলিত, জনজাতি ও অন্যান্য অনগ্রসর সম্প্রদায়কে লক্ষ্য করে তৈরি হয়েছিল, এই আইন ছিল অত্যন্ত দমনমূলক। স্বাধীনতার পরেও এসব সম্প্রদায়ের মানুষ বৈষম্য ও শোষণের শিকার হয়েছে। নতুন এই আইনগুলি ঐতিহাসিক অবিচারের বিনাশ করে ভারতের আইনি ব্যবস্থায় ন্যায়, সমতা এবং অন্তর্ভুক্তির ধারণাকে নিশ্চিত করেছে।

ভারতীয় ন্যায় সংহিতা (BNS)-এর একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য দিক হল, এটি শাস্তি প্রদানের পরিবর্তে ন্যায়বিচারের প্রতি গুরুত্ব দেয়। ভারতীয় ন্যায় সংহিতা মহিলা ও শিশুদের সুরক্ষা নিশ্চিত করতে গুরুত্বপূর্ণ সংস্কার চালু করেছে এবং এই মহিলা ও শিশুদের উপর অত্যাচারের ঘটনায় সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দেওয়ার মাধ্যমে সংস্কারের বিষয়ে গুরুত্ব দেয়।

ভারতীয় ন্যায় সংহিতা এবং তার সঙ্গে সম্পর্কিত আইনগুলি ভারতের ফৌজদারি বিচার ব্যবস্থার আধুনিকীকরণের জন্য একটি সাহসী এবং দূরদৃষ্টি সম্পন্ন পদক্ষেপ। এই সংস্কার সাংবিধানিক মূল্যবোধকে বজায় রাখার মাধ্যমে, নতুন ভারতের লক্ষ্যের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে আরও ন্যায়সংগত, অন্তর্ভুক্তিমূলক ও দূরদৃষ্টিসম্পন্ন আইন ব্যবস্থার দিকে এগিয়ে নিয়ে যাবে।

লন্ডনে ডঃ আম্বেদকরের মূর্তির সামনে নরেন্দ্র মোদী।

প্রতীকী পদ থেকে একঘরে করে দেওয়া

কীভাবে কংগ্রেস ডঃ আম্বেদকরের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করেছিল

ডঃ বি. আর. আম্বেদকর, ভারতীয় সংবিধানের প্রধান নির্মাতা এবং সামাজিক ন্যায়ের এক মহান যোদ্ধা, কংগ্রেস পার্টির দ্বারা তিনি বারবার অপমানিত হয়েছেন এবং তাঁকে একঘরে করে দেওয়া হয়েছিল। ডঃ আম্বেদকর সর্বদা কংগ্রেসের রাজনীতির এবং সামাজিক ন্যায়ের বিষয়ে তাদের প্রতীকী বা দেখনদারি রাজনীতির বিরোধিতা করেছিলেন। ১৯৪৫ সালে প্রকাশিত তাঁর বই 'What Congress and Gandhi Have Done to the Untouchables'-এ দলিত এবং পিছিয়ে পড়া শ্রেণির উন্নতির ক্ষেত্রে কংগ্রেসের ভূমিকা নিয়ে তীব্র সমালোচনা করেছিলেন।

ডঃ আম্বেদকরকে পরাজিত করার ষড়যন্ত্র

গণপরিষদ নির্বাচন: গণপরিষদে ২৯৬ জন সদস্য ছিলেন, এর মধ্যে ৩১টি আসন তফসিলিজাতিদের জন্য সংরক্ষিত ছিল, যারা রাজ্য বিধানসভা দ্বারা নির্বাচিত হয়েছিল। পক্ষপাতদুষ্টতা এবং প্রতিশোধের আশায়, কংগ্রেসের বম্বে প্রিমিয়ার, বি.জি. খারে, ডঃ আম্বেদকরকে সংবিধান সভায় নির্বাচনে পরাজিত করার চক্রান্ত করেছিলেন। কিন্তু নমশূদ্র নেতা যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডল, বাংলা থেকে আম্বেদকরকে জিতিয়েছিলেন।

১৯৫২ সালের লোকসভা নির্বাচন: প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরুর সরাসরি তত্ত্বাবধানে কংগ্রেস, কমিউনিস্টদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে ডঃ আম্বেদকরকে পরাজিত করার ব্যবস্থা করেছিল। এই ষড়যন্ত্রের নেতৃত্ব দেন কংগ্রেসের এস.কে. পাটিল এবং কমিউনিস্ট নেতা শ্রীপদ আ. ডাঙ্গে। তাঁরা একসঙ্গে একটি প্রচার চালান, যেখানে পরিচিত মুখ নয় এমন নারায়ণ রাও কাঝরোলকারকে প্রার্থী হিসেবে দাঁড় করানো হয়, যিনি ডঃ আম্বেদকরকে পরাজিত করতে সফল হন। ডঃ আম্বেদকর প্রধান নির্বাচন কমিশনারের কাছে একটি যৌথ নির্বাচনী পিটিশন দাখিল করেন যাতে ফলাফলটি বাতিল করে দেওয়া হয়। তাঁরা আরও দাবি করেছিলেন যে, "৭৪,৩৩৩টি ভোট পত্র বাতিল এবং গণনা করা হয়নি।"

১৯৫৪ সালের উপনির্বাচন: বান্দারা কেন্দ্রের উপনির্বাচনে কংগ্রেস আবারও ডঃ আম্বেদকরকে সংসদে প্রবেশ করতে বাধা দেয়, কাঝরোলকারকে আবার প্রার্থী করে। প্রধানমন্ত্রী নেহরু ব্যক্তিগতভাবে ডঃ আম্বেদকরের বিরুদ্ধে প্রচার চালান। ডঃ আম্বেদকরের পরাজয় শুধু একটি নির্বাচনী পরাজয় ছিল না। এটি অঘোষিতভাবে পরিষ্কার করে দেওয়া হয়, যে নেহরুর বিরোধিতা ও তাঁদের শাসনের প্রতি কোনও বিরুদ্ধ মতামত বা সমালোচনার কোনও স্থান নেই।

এডউইনা মাউন্টব্যাটেনকে একটি চিঠিতে নেহরু ১৯৫২ সালের নির্বাচনে ডঃ আম্বেদকরকে পরাজিত করার প্রয়োজনীয়তার কথা উল্লেখ করেন, যা কংগ্রেসের ডঃ আম্বেদকর প্রতি শত্রুতার মনোভাবকে আরও স্পষ্ট করে।

সরকারে উপেক্ষার শিকার

নেহরুর মন্ত্রিসভার একজন মন্ত্রী হিসেবে, ডঃ আম্বেদকরকে ইচ্ছাকৃতভাবে উপেক্ষা করা হয়েছিল। অর্থনীতি ও আইনে দক্ষতা থাকা সত্ত্বেও তাঁকে প্রতিরক্ষা ও পররাষ্ট্র বিষয়ক মন্ত্রিসভা কমিটি থেকে বাদ দেওয়া হয়েছিল। এমনকি সাধারণ দায়িত্ব এবং পোর্টফোলিও হস্তান্তরের ক্ষেত্রেও তাকে অগ্রাহ্য করা হয়, যা তাঁকে সরকারে অন্তর্ভুক্ত করতে কংগ্রেসের অনীহাকে প্রতিফলিত করে।

মরণোত্তর ভারতরত্ন সম্মানে ভূষিত ডঃ আম্বেদকর, ১৪ এপ্রিল, ১৯৯০।

নেহরুর মন্ত্রিসভা থেকে পদত্যাগ

ডঃ আম্বেদকরের ১৯৫১ সালে নেহরুর মন্ত্রিসভা থেকে পদত্যাগ তাঁর কংগ্রেস নিয়ে হতাশার আরও একটি উদাহরণ।

পদত্যাগের জন্য তিনি পাঁচটি কারণ উল্লেখ করেন:

১। অর্থনীতিতে পিএইচডি অর্জনকারী প্রথম ভারতীয় হওয়া সত্ত্বেও ডঃ আম্বেদকরকে অর্থনৈতিক নীতি ও প্রতিষ্ঠান থেকে দূরে সরিয়ে রাখার কংগ্রেসের প্রচেষ্টা।

২। দলিতদের সমস্যাকে উপেক্ষা করে কেবল মুসলমানদের বিষয়ে কংগ্রেসের মনোযোগ।

৩। কাশ্মীর ইস্যুতে নেহরুর হস্তক্ষেপে তাঁর বিরোধিতা।

৪। নেহরুর বিদেশ নীতির সমালোচনা। তিনি বলেছিলেন এই নীতি ভারতের ক্ষতি করবে।

৫। হিন্দু কোড বিল পাশ করার ব্যাপারে নেহরুর প্রতিশ্রুতির অভাব।

ভারতরত্ন দেওয়া হয়নি

ভারতের সংবিধান এবং সামাজিক ন্যায়বিচারে ডঃ আম্বেদকরের অতুলনীয় অবদান সত্ত্বেও, কংগ্রেস তাঁকে তাঁর প্রাপ্য স্বীকৃতি দিতে ব্যর্থ হয়:

নেহরু, ইন্দিরা গান্ধী এবং রাজীব গান্ধীর শাসনকালে, ডঃ আম্বেদকরকে ভারত রত্ন প্রদান করা হয়নি।

১৯৭০ সালে, কংগ্রেস পদ্মভূষণ পুরস্কার দেয় এন.এস. কাজরোলকারকে, যিনি ১৯৫২ সালের নির্বাচনে ডঃ আম্বেদকরকে পরাজিত করেছিলেন।

১৯৯০ সালে, বিজেপির সমর্থনে শ্রী ভি.পি. সিং-এর নেতৃত্বাধীন একটি অ-কংগ্রেস সরকার ডঃ আম্বেদকরকে মরণোত্তর ভারত রত্ন প্রদান করে। এই সময়েই শ্রী অটল বিহারী বাজপেয়ীর প্রচেষ্টায় সংসদে ডঃ আম্বেদকরের প্রতিকৃতি স্থাপন করা হয়।

নাগপুরে বৌদ্ধ ধর্মে দীক্ষা (১৪ অক্টোবর ১৯৫৬)

স্মৃতিস্তম্ভ নির্মাণে অবহেলা

কংগ্রেস ডঃ আম্বেদকরের স্মৃতিকে সম্মান জানাতে যথাযথ স্মৃতিস্তম্ভ নির্মাণে অবহেলা করে, অথচ নেহরু পরিবারকে সম্মান জানাতে ৫০ একর জমিতে স্মৃতিস্তম্ভ তৈরি করে।

১৯৫৬ সালে তাঁর মৃত্যুর পর, দিল্লির ২৬ আলিপুর রোডে ডঃ আম্বেদকরের বাসভবনকে জাতীয় স্মৃতিস্তম্ভে রূপান্তরিত করার প্রস্তাব দেওয়া হয়। তবে, নেহরু এই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন। ২০১৬ সালে মোদী সরকারের অধীনে এই স্মৃতিস্তম্ভের ভিত্তি স্থাপন করা হয় এবং ২০১৮ সালে এটি উদ্বোধন করা হয়।

শিক্ষামূলক বিষয়বস্তুর মাধ্যমে উপহাস

২০১২ সালে কংগ্রেস নেতৃত্বাধীন ইউপিএ-২ সরকারের সময়, এনসিইআরটি-র একাদশ শ্রেণির পাঠ্যবইয়ে ডঃ আম্বেদকরকে অপমান করে এমন একটি কার্টুন অন্তর্ভুক্ত ছিল, যেখানে তাঁকে জওহরলাল নেহরু দ্বারা চাবুক মারা হচ্ছে বলে দেখানো হয়।

ডঃ আম্বেদকর এবং অনুচ্ছেদ ৩৭০

ডঃ আম্বেদকর জম্মু ও কাশ্মীরকে বিশেষ মর্যাদা দেওয়া অনুচ্ছেদ ৩৭০-এর তীব্র বিরোধিতা করেছিলেন। কিন্তু কংগ্রেস তার সতর্কবার্তা উপেক্ষা করে এটি বাস্তবায়ন করেছিল। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বলেছেন, অনুচ্ছেদ ৩৭০ বাতিল এবং জম্মু ও কাশ্মীরের সম্পূর্ণ সাংবিধানিক একীকরণ ডঃ আম্বেদকরের একটি অখণ্ড ভারতের স্বপ্নের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ।

ডঃ আম্বেদকর এবং নারীর অধিকার

ডঃ আম্বেদকরের মতে, একটি সমাজের উন্নতির মানদণ্ড নারীদের অগ্রগতির মাধ্যমে পরিমাপ করা যায়। কিন্তু নেহরুর নেতৃত্বাধীন কংগ্রেস হিন্দু কোড বিল পাস করতে ব্যর্থ হয়েছিল, যা নারীদের ক্ষমতায়ন করতে পারত। পরবর্তীকালে কংগ্রেস সরকারগুলি সংসদ ও রাজ্য বিধানসভায় মহিলাদের যথাযথ প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করতে ব্যর্থ হয়। ২০২৩ সালে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বাধীন বিজেপি সরকার নারী শক্তি বন্দন অধিনিয়ম পাস করেছে।

দেশভাগ-পরবর্তী দলিত শরণার্থীদের অবহেলা:

দেশভাগের পরে পাকিস্তান থেকে আসা দলিত শরণার্থীরা প্রচুর কষ্টের সম্মুখীন হয়েছিলেন। কংগ্রেস সরকার তাদের ভারতীয় নাগরিকত্ব প্রদান বা পুনর্বাসনের জন্য যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করেনি। বিশেষ করে পূর্ব পাকিস্তান থেকে আগত নমশূদ্র ও মতুয়া সম্প্রদায়ের মানুষ, ডঃ আম্বেদকরের আবেদন সত্ত্বেও তাদের প্রয়োজনীয় সহায়তা পায়নি।

ডঃ আম্বেদকর এবং অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণির কল্যাণ

সংবিধানে অনগ্রসর শ্রেণীর জন্য কোনও সুরক্ষার কথা বলা হয়নি। রাষ্ট্রপতির নিয়োগ করা কমিশনের সুপারিশের ভিত্তিতে এই ব্যবস্থা নেওয়ার কথা ছিল। ডঃ আম্বেদকর সরকারের কাছে অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণির সংরক্ষণ চালু করার জন্য পদক্ষেপ নেওয়ার কথা বলেছিলেন, কিন্তু কংগ্রেস এই উদ্যোগগুলিকে বারবার বাধা দিয়েছিল।

কাকা কালেলকার রিপোর্ট (১৯৫৬) বাতিল

নেহরু সরকার কাকা কালেলকার কমিশনের সুপারিশগুলি প্রত্যাখ্যান করে, যা অনগ্রসর শ্রেণীর জন্য সংরক্ষণের প্রস্তাব দিয়েছিল।

সংরক্ষণের উপর নেহরুর চিঠি (১৯৬১)

১৯৬১ সালে নেহরু রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীদের কাছে একটি চিঠি

লিখে সংরক্ষণের বিরোধিতা করেন। তিনি দাবি করেছিলেন, সংরক্ষণ অদক্ষতা আনবে এবং মানের অবনতি ঘটাবে। এমন মন্তব্য সমাজে বঞ্চিত অংশের প্রতি কংগ্রেসের অবজ্ঞা প্রকাশ করে।

ইন্দিরা গান্ধী অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণির সংরক্ষণ বন্ধ করে দেন

ইন্দিরা গান্ধী মণ্ডল কমিশনের রিপোর্ট বাস্তবায়নে বিলম্ব করেছিলেন, যার ফলে অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণির সংরক্ষণ ব্যবস্থায় বিলম্ব হয়েছিল।

রাজীব গান্ধীর তফসিলি সংরক্ষণের অবমাননা (১৯৮৫)

১৯৮৫ সালের ৩রা মার্চ, প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধী তফসিলিসংরক্ষণের বিরোধিতা করে বলেছিলেন, "আমাদের সংরক্ষণের মাধ্যমে বোকাদের উৎসাহিত করা উচিত নয়।" এই মন্তব্য কংগ্রেসের দলিত, জনজাতি এবং পিছিয়ে পড়া সম্প্রদায়ের প্রতি অসংবেদনশীল মনোভাবকে প্রকাশ করে। এই মন্তব্য তাদের সাংবিধানিক অধিকার এবং সংগ্রামের প্রতি অবজ্ঞার একটি জলজ্যান্ত উদাহরণ।

মণ্ডল কমিশন প্রতিবেদনের বিরোধিতা (১৯৯০)

১৯৯০ সালের লোকসভা অধিবেশনে রাজীব গান্ধী মণ্ডল কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী অন্যান্য অনগ্রসর সম্প্রদায়ের সংরক্ষণের বিরোধিতা করেছিলেন। তৎকালীন কংগ্রেস দল প্রকাশ্যে সংরক্ষণের বিরুদ্ধে বিজ্ঞাপন দিয়ে প্রচার চালায়। এই বিজ্ঞাপনে দলিত ও জনজাতিদের জন্য সংরক্ষণ বন্ধ করার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়।

তফসিলি উপজাতির সংরক্ষণ কমিয়ে দেওয়ার চক্রান্ত

কংগ্রেস বহুবার মুসলমান এবং খ্রিস্টানদের তফসিলি জাতিও উপজাতির সংরক্ষণে অন্তর্ভুক্ত করার চেষ্টা করেছে। এটি সরাসরি সংবিধান এবং ডঃ বি.আর. আম্বেদকরের নেতৃত্বে ১৯৫০ সালে আইন মন্ত্রক যে সংবিধান আদেশ জারি করেছিল, তার পরিপন্থী।

সরকারি অনুদানপ্রাপ্ত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, যেমন জামিয়া মিলিয়া ইসলামিয়া (২০১১) এবং আলীগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়কে (১৯৮১), কংগ্রেস সরকার সংখ্যালঘু শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান হিসেবে ঘোষণা করেছিল। এর ফলে তফসিলিজাতি, উপজাতি এবং অন্যান্য অনগ্রসর সম্প্রদায় সংরক্ষণের সুবিধা থেকে বঞ্চিত হয়। কংগ্রেস এখনও এই সংরক্ষণ বাস্তবায়নের যে কোনও চেষ্টার বিরোধিতা করে চলেছে।

এছাড়া, ২০০৫ সালে শীর্ষ আদালতের ইনামদার মামলার রায় যাতে কার্যকর না হয়, তার জন্যে কংগ্রেস ৯৩তম সাংবিধান সংশোধনী এনেছিল। কিন্তু সংখ্যালঘু শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলি এই সংরক্ষণের বাধ্যবাধকতা থেকে অব্যহতি পায়।

ধর্মের ভিত্তিতে সংরক্ষণের প্রচেষ্টা

কংগ্রেস বারবার মুসলমানদের জন্য ধর্মের সংরক্ষণের পক্ষে সওয়াল করেছে। তবে তাদের এই প্রস্তাব কখনোই আইনের চোখে টিকতে পারেনি এবং সংবিধানের মূল আদর্শের পরিপন্থী।

মুসলমান জনসংখ্যার একটি বড় অংশ ইতিমধ্যেই অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণিতে অন্তর্ভুক্ত এবং সংরক্ষণের সুবিধা পায়। এছাড়াও, মুসলমানসহ আর্থিকভাবে দুর্বল শ্রেণির মানুষ,আর্থিকভাবে অনগ্রসর শ্রেণির জন্যে বিশেষ সংরক্ষণের সুবিধা পায়। তাই মুসলমানদের জন্য আলাদা ধর্মভিত্তিক সংরক্ষণ দাবি করা অপ্রয়োজনীয় এবং সংবিধানবিরোধী।

কংগ্রেসের এই ধরনের বিভাজনমূলক নীতিগুলি শুধু অবাস্তবই নয়, বিপজ্জনক। এটি সমাজের সম্প্রীতির ভিতকেও দুর্বল করে দেয়। এই দাবি দেশভাগের ভয়ঙ্কর স্মৃতিকে উস্কে দেয়।

ধারা ৩৫৬-এর অপব্যবহার

গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত রাজ্য সরকারগুলোকে ক্ষমতাচ্যুত করার জন্য কংগ্রেস ৯০ বারেরও বেশি ধারা ৩৫৬-এর অপব্যবহার করেছে। রাজনৈতিক ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত করার উদাহরণ বার বার রেখে গিয়েছে এই দল।

এই ধারার প্রয়োগ বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই ভিত্তিহীন বা সাজানো অভিযোগের ভিত্তিতে করা হয়েছিল। এর মাধ্যমে বিরোধী দলগুলির নেতৃত্বাধীন রাজ্যগুলিতে অস্থির পরিস্থিতির সৃষ্টি করে এক বিশেষ পরিবারের শাসন কায়েম করার চেষ্টা করা হয়েছিল।

৩৫৬ ধারার এই অপব্যবহার ভারতের যুক্তরাষ্ট্রীয় পরিকাঠামোকে দুর্বল করেছে এবং রাজ্যগুলির স্বাধীনতা খর্ব করেছে, যা ভারতের গণতন্ত্রের ভিতকে অনেকটাই দুর্বল করে দিয়েছে।

অভিন্ন দেওয়ানি বিধি (UCC) রোধ

অভিন্ন দেওয়ানি বিধি (U C C) কার্যকর করার বিষয়টি সংবিধানের নির্দেশিকা নীতিতে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা থাকলেও কংগ্রেস বরাবর এর বিরোধিতা করে এসেছে। কংগ্রেস দেশের বৃহত্তর স্বার্থের বদলে বার বারই সংখ্যালঘুদের তুষ্ট করার, ভোটব্যাংক রাজনীতিকে বেছে নিয়েছে।

ডঃ আম্বেদকর অভিন্ন দেওয়ানি বিধির পক্ষে সওয়াল করে সংবিধান সভায় বলেছিলেন: "আমি বুঝতে পারি না কেন ধর্মকে এত বড় ক্ষমতা দেওয়া উচিত, যাতে এটি জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে প্রবেশ করে এবং আইন প্রণেতাকে সেই ক্ষেত্রে হস্তক্ষেপ করা থেকে বিরত রাখে। আমরা এই স্বাধীনতা কেন পাচ্ছি? আমাদের সামাজিক ব্যবস্থা, যা বৈষম্য এবং অসাম্যের মতো ত্রুটিতে ভরা, তা সংস্কার করার জন্য আমরা এই স্বাধীনতা পেয়েছি।"

'আধা কোটি' পার
বঙ্গ বিজেপি পরিবার

শুভ্র চট্টোপাধ্যায়

দেরীতে সদস্যতা অভিযান শুরু করেও 'আধা কোটি' পার! সদস্য হওয়ার জন্য তুমুল উৎসাহ মহিলাদের মধ্যে। সন্ত্রাস-সমালোচনাকে বুড়ো আঙ্গুল দেখিয়ে 'আধা কোটি' পার। আধা কোটি মানে আসলে বঙ্গ বিজেপি ২ কোটি মানুষের কাছে পৌঁছল। জেহাদি মুক্ত, সুশাসনযুক্ত পশ্চিমবঙ্গ পেতে রাজ্যের মানুষ মনেপ্রাণে চাইছেন বিজেপিকে। সদস্যতা অভিযান আধা কোটি পার হওয়া তারই প্রমাণ।

বিজেপির সদস্যতা অভিযানে ব্যাপক সাড়া পশ্চিমবঙ্গে। তৃণমূলের সন্ত্রাসকে উপেক্ষা করেও 'আধা কোটি' পার করল বঙ্গ বিজেপির সদস্যতা। সদস্যতা অভিযানের সাফল্যে উচ্ছ্বসিত দলের নেতা-কর্মীরা। শুধু তাই নয়, সদস্যতা অভিযানের আবহে বিজেপির নেতা-কর্মীরা প্রায় ২ কোটি মানুষের কাছে পৌঁছেছেন। বিজেপির রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার সংবাদমাধ্যমকে বলেন জানুয়ারির গোড়াতেই বলেছিলেন, "৪০ লাখ পার করে দিয়েছি। আশা করি ১০ জানুয়ারির মধ্যে ৫০ লাখ হয়ে যাবে।" ঠিক সেটাই অক্ষরে অক্ষরে করে দেখাল বঙ্গ বিজেপি।

প্রসঙ্গত, সারাদেশের নিরিখে কিছুটা দেরিতেই শুরু হয়েছিল বঙ্গ বিজেপির

সদস্যতা অভিযান। তারপরেও এই ব্যাপক সাফল্য বিজেপির প্রতি বাংলার মানুষের বিপুল সমর্থনেরই প্রতিফলন, এমনটাই মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা। দেরিতে সদস্যতা অভিযান শুরু হওয়ার কারণ ছিল আরজি কর আন্দোলন এবং তারপর দুর্গাপুজো। এই কারণেই সদস্য সংগ্রহ অভিযান দেরিতে শুরু হয়। গোটা দেশের তুলনায় প্রায় দেড় মাস পর শুরু হয় বঙ্গ বিজেপির কর্মসূচি। তাই সদস্যতা অভিযান শেষ করার দিন ১০ জানুয়ারি করা হয়েছিল।

সম্প্রতি সদস্যতা অভিযানের পর্যালোচনা বৈঠক হয় সেক্টর ফাইভে। তৃণমূলের প্রবল সন্ত্রাস উপেক্ষা করেও যেভাবে বঙ্গ বিজেপির নেতা-কর্মীরা সদস্যতা অভিযানকে সফল করেছেন তাতে খুশি কেন্দ্রীয় নেতৃত্বও। সম্প্রতি, সেক্টর ফাইভে বৈঠকে বসেছিলেন বিজেপি নেতৃত্ব। সেখানে হাজির ছিলেন রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার, বঙ্গ বিজেপির কেন্দ্রীয় পর্যবেক্ষক এবং বিজেপির সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক সুনীল বনসল, বঙ্গ বিজেপির কেন্দ্রীয় সহ

পর্যবেক্ষক অমিত মালব্য, রাজ্য বিজেপির সাংগঠনিক সাধারণ সম্পাদক অমিতাভ চক্রবর্তী, সাংসদ শমীক ভট্টাচার্য-সহ অন্যান্যরা। ওই বৈঠকেই সদস্যতা অভিযানের নানা খুঁটিনাটি বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়।

অনেকেই মনে করছেন, তৃণমূলের সন্ত্রাসকে উপেক্ষা করেও যেভাবে পশ্চিমবঙ্গের মানুষ দলে দলে বিজেপির সদস্যপদ নিয়েছেন, তাতে একটা বিষয় পরিষ্কার যে সারা রাজ্যে সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণের সমর্থন এখনও বিজেপির দিকেই রয়েছে। সদস্যতা অভিযানে এই ব্যাপক সাফল্যের পিছনে অনেক কারণ রয়েছে। সবচেয়ে বড় কারণ হল মমতা সরকারের বিরুদ্ধে জনরোষ। একথা সকলেই স্বীকার করেন যে ভোটে কারচুপি এবং সন্ত্রাস করেই ক্ষমতা ধরে রাখতে হয় শাসক দলের নেতাদের। পঞ্চায়েত নির্বাচন হোক, বিধানসভা হোক কিংবা লোকসভা সর্বত্র দেখা গিয়েছে শাসক দলের গুণ্ডামি-সন্ত্রাসের চিত্র। সারা রাজ্যের গণতন্ত্রের কি অবস্থা! তা গোটা দেশ জেনেছে। পঞ্চায়েত থেকে লোকসভা ভোট পর্যন্ত মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের রাজনীতি চলে বিরোধী লাশের উপরে। এই আবহে বধ্যভূমি হয়ে দাঁড়িয়েছে পশ্চিমবঙ্গ। মানুষ পরিত্রাণ খুঁজছেন ২০১১ সালে পরিবর্তনের স্লোগান দিয়ে আসা তৃণমূল সরকারের কাছ থেকে। বিকল্প হিসেবে অবশ্যই বিজেপিকেই চাইছেন পশ্চিমবঙ্গের জনগণ।

বিজেপির পঞ্চশীল নীতি, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির উন্নয়নমূলক কাজকর্ম, স্বচ্ছ ভাবমূর্তির কারণেই বাংলার মানুষ বিজেপির প্রতি আকৃষ্ট। প্রত্যেকেই তাই দলে দলে বিজেপির সদস্য হয়েছেন। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ভেবেছিলেন যে প্রতি মাসে সাধারণ মহিলাদের হাজার টাকা এবং তপশিলি ও তপশিলি উপজাতি মহিলাদের দেড় হাজার টাকা করে ভাতা প্রদান করে তিনি গোটা মহিলা ভোটব্যাঙ্কে কিনে নেবেন। কিন্তু রাজ্যের মহিলারা যে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে বিক্রি হয়ে যাননি, তার প্রমাণ বিজেপির ব্যাপক সদস্যতা। রাজ্যজুড়ে বিজেপির সদস্য হতে মহিলাদের উন্মাদনা চোখে পড়েছে। সাম্প্রতিক সময়ে পশ্চিমবঙ্গ উত্তাল হয়েছে আরজি কর ইস্যুতে। রাজ্যের অলি-গলিতে বের হয়েছে মিছিল। একরাশ ক্ষোভ, ধিক্কার রাজ্যের মানুষ জানিয়েছেন মমতা সরকারকে। ধিক্কার জানিয়েছেন রাজ্যের মহিলারাও। তারও প্রতিফলন দেখা গিয়েছে বিজেপির সদস্য অভিযানে। কারণ সেই সময় একমাত্র দল হিসেবে ভারতীয় জনতা

পার্টি রাস্তায় থেকেছে। মমতা জমানায় নারী নির্যাতন যেভাবে প্রতিদিনের রুটিন হয়ে দাঁড়িয়েছে, তা বিধানসভার ভিতরে ও বাইরে তুলে ধরেছে বিজেপি। সারা রাজ্যজুড়ে গণ আন্দোলনকে নেতৃত্ব দিয়েছে বিজেপি। জায়গায় জায়গায় বিক্ষোভ প্রদর্শন করেছেন বিজেপির নেতা-কর্মীরা। হয়েছেন গ্রেফতার। কিন্তু বাকি দুই রাজনৈতিক দল কংগ্রেস ও সিপিএমের বিশ্বাসযোগ্যতা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। তৃণমূলের সঙ্গে ইন্ডি জোটে তাদের সখ্যতা রাজ্যের মানুষের দৃষ্টি এড়ায়নি। তাই আরজি কর ইস্যুতে আন্দোলন করলেও তৃণমূল বিরোধিতায় কংগ্রেস-সিপিএম কতটা আন্তরিক সে প্রশ্ন থেকেই গিয়েছে। পশ্চিমবঙ্গে কংগ্রেস ও সিপিএম জোট তৃণমূলের সঙ্গে লড়াই করার ভান করে অন্যদিকে দিল্লিতে ইন্ডি জোটের শরিক হয়ে একে অপরের পাশে দাঁড়ায়। কংগ্রেস-তৃণমূল বা সিপিএম-তৃণমূলের মিথ্যা লড়াই দেখিয়ে তাই রাজ্যের মানুষের আইওয়াশ করা যাবে না। কারণ দিল্লিতে কংগ্রেস-তৃণমূল-সিপিএম একই। কোনও ফারাক বা পার্থক্য নেই। রাজ্য থেকে কংগ্রেস জিতলেও আসন সংখ্যা ইন্ডি জোটে যোগ হয়, আবার তৃণমূল জিতলেও তাই হয়। তাই খুব স্বাভাবিকভাবে এ প্রশ্ন আজ আর শুধু রাজনৈতিক মহলে সীমাবদ্ধ নেই। এই প্রশ্ন সাধারণ মানুষ তুলছে এবং পশ্চিমবঙ্গের সাধারণ মানুষ কংগ্রেস-তৃণমূল-সিপিএমকে 'কংসিমূল ' জোট হিসেবেই দেখছে। স্বাভাবিকভাবে সাধারণ মানুষ কংগ্রেস সিপিএম জোটকে নয় বরং বিজেপিকেই তৃণমূল কংগ্রেসের বিকল্প হিসেবে ভাবছে। এই সদস্যতা অভিযানে তারই প্রমাণ মিলেছে।

অন্যদিকে পশ্চিমবঙ্গের মানুষের সামগ্রিক উন্নয়নের প্রশ্নে, যুবকদের কর্মসংস্থানের প্রশ্নে, মহিলাদের নিরাপত্তার প্রশ্নে, বাংলাদেশ সীমান্তকে সুরক্ষিত রাখার প্রশ্নে বিজেপিকে ব্যাপকভাবে সমর্থন করছেন সাধারণ মানুষ যার প্রমাণ সদস্যতা অভিযান। বাংলাদেশের বর্তমান স্থিতি দেখে পশ্চিমবঙ্গের সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণ আশঙ্কিত, তৃণমূলের জমানায় পশ্চিমবঙ্গের পশ্চিম বাংলাদেশ হওয়া কেবল সময়ের অপেক্ষায়। বাংলাদেশের মতোই এই বঙ্গেও একাধিক জায়গায় জেহাদি হামলা দেখা গিয়েছে। হাজারদুয়ারি সমেত অন্যত্র নাশকতার উদ্দেশে জড়ো হওয়া বাংলাদেশি জঙ্গিদের সঙ্গে শাসক দলের যোগ বলে দিচ্ছে তৃণমূল জমানায় ঠিক কেমন রয়েছে পশ্চিমবঙ্গ। জেহাদি মুক্ত, সুশাসনযুক্ত পশ্চিমবঙ্গ পেতে রাজ্যের মানুষ মনেপ্রাণে চাইছেন বিজেপিকে। সদস্যতা অভিযান আধা কোটি পার হওয়া তারই প্রমাণ।

ছবিতে খবর

সল্টলেকে বিশেষ সাংগঠনিক বৈঠকে কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব ও রাজ্য পদাধিকারীগণ।

সদস্যতা অভিযান উপলক্ষ্যে রাজ্যের শীর্ষ নেতৃত্ব থেকে বুথ সভাপতি পর্যন্ত সকল স্তরের নেতৃবৃন্দ পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন বুথে বুথে বিশেষ সদস্যতা অভিযানে কর্মসূচিতে।

ভারতীয় জনতা পার্টির কোলকাতা উত্তর শহরতলী সাংগঠনিক জেলার সংগঠন পর্বের "মন্ডল নির্বাচন আধিকারিক" কর্মশালায় জেলা-মন্ডল নেতৃত্ব ও অন্যান্য কার্যকর্তাদের সঙ্গে বিজেপি সাংগঠনিক সাধারণ সম্পাদক শ্রী অমিতাভ চক্রবর্তী।

জাতীয় যুব দিবসে স্বামী বিবেকানন্দের পৈতৃক ভিটায় রাজ্য সভাপতি তথা কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী ড. সুকান্ত মজুমদার, যুব মোর্চা সভাপতি ডাঃ ইন্দ্রনীল খাঁ সহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দের স্বামীজির প্রতি শ্রদ্ধার্ঘ্য।

সাঁইথিয়া- অন্ডাল রুটের নিত্য যাত্রীদের দাবিপত্র নিয়ে পূর্ব রেলের জেনারেল ম্যানেজার শ্রী মিলিন্দ দেওস্করের সঙ্গে আলোচনায় রাজ্য বিজেপি সাধারণ সম্পাদক জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায়।

বিজেপি শিলিগুড়ি সাংগঠনিক জেলার সংগঠন পর্বের "মন্ডল নির্বাচন আধিকারিক"(MRO) কর্মশালায় রাজ্য সাধারণ সম্পাদক সংগঠন শ্রী অমিতাভ চক্রবর্তী সহ বিজেপি নেতৃত্ব এবং কর্মীবৃন্দ।

ভারতীয় জনতা পার্টি সংগঠন পর্বের "মন্ডল নির্বাচন আধিকারিক"(MRO) কর্মশালা উপলক্ষ্যে আসানসোল ও কাঁথি সাংগঠনিক জেলার কর্মশালায় রাজ্যের শীর্ষ নেতৃত্ব, বুথ সভাপতি সহ সকল স্তরের নেতৃবৃন্দ।

ছবিতে খবর

ব্যারাকপুরে রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ মিশনে বি.এড কলেজ উদ্বোধন অনুষ্ঠানে ভারত সরকারের উত্তর-পূর্বাঞ্চল উন্নয়ন ও শিক্ষা মন্ত্রকের প্রতিমন্ত্রী তথা রাজ্য বিজেপির সভাপতি ডঃ সুকান্ত মজুমদার।

'যুব দিবস' উপলক্ষ্যে বিজেপি মালদা জেলা কার্যালয়ে 'যুব প্রেরণা' অনুষ্ঠানে রাজ্য সাধারণ সম্পাদক (সংগঠন) শ্রী অমিতাভ চক্রবর্তী সহ অন্যান্য রাজ্য ও জেলা নেতৃবৃন্দ।

সিমলা স্ট্রিট-এ বিশ্ববরেণ্য বীর সন্ন্যাসী স্বামী বিবেকানন্দের জন্মজয়ন্তী উদযাপনে বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী সহ অন্যান্য রাজ্য ও জেলা নেতৃবৃন্দ।

স্বামী বিবেকানন্দের জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে আসানসোল রামকৃষ্ণ মিশন প্রাক্তনীদের পক্ষ থেকে প্রভাতফেরী।

ভাটপাড়ায় জাতীয় যুব দিবস এবং কম্বল বিতরণ অনুষ্ঠানে রাজ্য বিজেপি মহিলা মোর্চার সভানেত্রী শ্রীমতী ফাল্গুনী পাত্র।

. ভারতীয় জনতা পার্টি সংগঠন পর্বের "মন্ডল নির্বাচন আধিকারিক"(MRO) কর্মশালা উপলক্ষ্যে পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন সাংগঠনিক জেলায় রাজ্যের শীর্ষ নেতৃত্ব থেকে বুথ সভাপতি পর্যন্ত সকল স্তরের নেতৃবৃন্দ।

ছবিতে খবর

হাওড়ার দাশনগর বালটিকুরী বাজারে 'অটল বিহারী বাজপেয়ী স্মৃতি রক্ষা কমিটি'-র জাতীয় যুব দিবস উদযাপনে বিরোধী দলনেতা শ্রী শুভেন্দু অধিকারী।

চন্দ্রপুরের বড়ঘাটা এলাকায় সদস্য সংগ্রহে রাজ্য বিজেপির সাধারণ সম্পাদক জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায় ও অন্যান্য নেতৃবৃন্দ।

হাবড়া বিধানসভার মন্ডল -২ এর কার্যকর্তাদের সাথে নিয়ে বিজেপি বারাসাত সাংগঠনিক জেলার সংগঠন পর্বের "S.K.R.O. কর্মশালায়" রাজ্য বিজেপি মহিলা মোর্চার সভানেত্রী শ্রীমতী ফাল্গুনী পাত্র।

দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার সংগঠন পর্বের "মন্ডল নির্বাচন আধিকারিক" কর্মশালায় দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা বিজেপি সভাপতি শ্রী স্বরূপ চৌধুরী সহ বিজেপি নেতৃত্ব এবং কর্মীবৃন্দ।

হাওড়া গ্রামীণ সাংগঠনিক জেলায় সংগঠন পর্ব - বিশেষ কর্মশালা।

তমলুক সাংগঠনিক জেলায় সংগঠন পর্বের বিশেষ কর্মশালা।

দূর-দূরান্ত থেকে আগত পূজনীয় সাধু-সন্তগণ এবং পূণ্যার্থীদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে কলকাতার গঙ্গাসাগর ক্যাম্পে ভারত সরকারের উত্তর-পূর্বাঞ্চল উন্নয়ন ও শিক্ষা মন্ত্রকের প্রতিমন্ত্রী তথা রাজ্য বিজেপির সভাপতি ডঃ সুকান্ত মজুমদার।

গঙ্গাসাগর মেলায় তীর্থ যাত্রীদের সেবায় নিয়োজিত "সাগর স্বচ্ছ ভারত সেবাদল" সংগঠনের ক্যাম্প উদ্বোধনে রাজ্য বিজেপি সাধারণ সম্পাদক অগ্নিমিত্রা পাল।

বনগাঁ লোকসভার স্বরূপনগরে ইছামতি নদীর উপর এক-লেন সড়ক সেতু নির্মাণের শুভারম্ভ ও ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন অনুষ্ঠানে কেন্দ্রীয়মন্ত্রী শ্রী শান্তনু ঠাকুর।

প্রবীণ বিজেপি নেতা শ্রী অনিন্দ্য গোপাল মিত্রের প্রতি রাজ্য বিজেপি নেতৃত্বের শেষ শ্রদ্ধা।

বাবাসাহেবের দূরদৃষ্টি সংবিধানের রক্ষাকবচ

নারায়ণ চক্রবর্তী

আম্বেদকরজী সবিনয়ে দৃঢ়তার সঙ্গে ধর্মনিরপেক্ষতা এবং সমাজতন্ত্রের দাবী খারিজ করেছিলেন। তাঁর বক্তব্য ছিল, ভারতের সংবিধানের দুটি স্তম্ভের একটি হল গণতন্ত্র, অন্যটি সর্বধর্মের সহাবস্থান। সুতরাং এই Secular কথাটি ভারতের সংবিধানে অবান্তর।

ভারতের সংবিধান প্রণেতা কমিটির প্রধান ড. ভীমরাও রামজি আম্বেদকর, স্বাধীন ভারতের প্রথম আইন মন্ত্রী এবং সংবিধান বিশেষজ্ঞ যখন দেশের সংবিধান রচনার দায়িত্ব নিলেন, তখন সংবিধানের খসড়া তৈরীর প্রায় শেষ দিকে সচেতনভাবে কম্যুনিস্টদের তরফে ১৯৪৮ সালের জুন মাসে অধ্যাপক K.T. Shah-র মারফত তোলা 'ধর্মনিরপেক্ষ' ও 'সমাজতান্ত্রিক' রাষ্ট্র হিসেবে ভারতকে ঘোষণা করার দাবীকে আম্বেদকরজী নস্যাৎ করেছিলেন। তিনি একটি দৃষ্টান্তমূলক যুক্তি দেখিয়ে জবাবে বলেছিলেন, আমাদের দেশের সংবিধানে সব ধর্মের মানুষের সমান ধর্মাচরণের অধিকার fundamental rights-এ স্বীকৃত। অবশ্য অন্য ধর্মাবলম্বীসহ প্রশাসনকে কোন অসুবিধায় না ফেলে এই ধর্ম পালনের অধিকার দেওয়া হয়েছে। অথচ 'ধর্মনিরপেক্ষ' রাষ্ট্র ভারতীয় উপমহাদেশে কেন, সমগ্র এশিয়ায় একটিও নেই। এমনকি গণপ্রজাতন্ত্রী চিনেও দেখেছি, মানুষের ধর্মাচরণে বাধা দেওয়া হয় না। শুধুমাত্র সে দেশের প্রশাসনের কোন ধর্মের প্রতি আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি নেই। ভাবতে পারেন, সেখানে ২০১৮ সালে কম্যুনিস্ট স্থানীয় নেতার পরিবারকে বুদ্ধ মন্দিরে গিয়ে পুজো দিতে দেখেছি। আবার আগ্রাসী ইসলাম ধর্মাবলম্বীদের ধর্ম পালনের নামে প্রশাসনিক কাজে হস্তক্ষেপের কারনে তাদের প্রকাশ্যে ধর্মাচরণ বন্ধ করে দিতেও দেখা গেছে।

এই বিষয়ে ভারতীয় কম্যুনিস্টরা নিশ্চুপ। তাদের অনেক নেতাই যে চীনের কম্যুনিস্ট নেতাদের উচ্ছিষ্ট ভোগী! এই ভারতীয় নেতাদের একমাত্র উদ্দেশ্য কিভাবে ভারতে দেশাত্মবোধ তৈরীতে বাধা দেওয়া যায়। তারা 'ধর্মনিরপেক্ষতা'র বুলি তাদের জন্মের শুরু থেকেই আউড়ে চলেছে একটি মাত্র উদ্দেশ্যে - দেশের সনাতনী হিন্দুদের ধর্মপালনের মধ্যেই ভারতমাতার বন্দনা করা হয়, যা দেশাত্মবোধ জাগিয়ে তোলে, তার বিরোধীতা করা। লক্ষ্য করলে বোঝা যায়, এরা জাতীয় গান বন্দেমাতরমের বিরোধী। একই সঙ্গে সংবিধান স্বীকৃত বিবিধের মাঝে মিলনের যে সুর আমাদের জাতীয় সংগীতে অনুরণিত হয়েছে, তারও বিরোধীতা এরা করেছে। আসলে এই বিরোধীতার বাধ্যবাধকতা তাদের ছিল অন্য আরেকটি কারনেও! অখন্ড ভারতের সিপাহী বিদ্রোহর সময় থেকে বঙ্গভঙ্গ রদের আন্দোলন পর্যন্ত বৃটিশ রাজশক্তির বিরুদ্ধে দেশের হিন্দু-মুসলমান-শিখ সকলে একসঙ্গে আন্দোলন করেছিলেন। তারপর ১৯২০ সালে গান্ধীজি তথা কংগ্রেসের মারাত্মক ভুল সিদ্ধান্তের খেসারত এখনো পর্যন্ত দেশবাসীকে দিতে হচ্ছে। অবশ্য দেশের কংগ্রেস দল এবং কম্যুনিস্টরা কখনো তাদের ভুল স্বীকার করেনি। ফলস্বরূপ তারা ধীরে ধীরে জনমানস থেকে হারিয়ে যাচ্ছে।

আরেকটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্যকে জনসাধারণের গোচরে আনা হয় না। তা হল, কম্যুনিস্ট পার্টির জেনারেল সেক্রেটারি গঙ্গাধর অধিকারীর তত্ত্ব। সেখানে ভারতকে কম্যুনিস্টরা "Union of States" বলে চিহ্নিত করেছে। এই তথ্য CPIM দলের আর্কাইভে আছে। অনেক চাপের মধ্যেও আম্বেদকরজী, সাধারণ ভাবে 'বাবাসাহেব' নামে পরিচিত, এই তত্ত্বের বিপরীত মত পোষণ করতেন। তিনি সংবিধানে দেশের কেন্দ্রীয় সরকারের ক্ষমতার লঘুকরন করতে দেননি। শুরু থেকেই কম্যুনিস্টদের সব নামের সব দলের কাছেই ভারতের অখন্ডতা চক্ষুশূল। তারা রাজ্যগুলিকে সবল করে কেন্দ্রকে দুর্বল রাখার যুক্তি দিয়েছিলেন ভবিষ্যতে উপযুক্ত পরিবেশে দেশকে টুকরো করা।

লক্ষ্য করার বিষয় হল, কম্যুনিস্টরা তাদের চরিত্র এত বছরে পরিবর্তন না করার কারনে তাদের উদ্দেশ্য দেশের মানুষের কাছে ধরা পড়ে গেছে। এই কম্যুনিস্টরা দেশভাগের সময় প্রচন্ড পাক-ই-স্তান এবং ইসলাম প্রীতি দেখালেও স্বাধীনতা প্রাপ্তির পর তারা ভারতেই থেকে যায়! শুধুমাত্র কতিপয় পাক-ই-স্থানের ভূখন্ডে বসবাসকারী কম্যুনিস্ট সেখানে থাকার চেষ্টা করে। এক কম্যুনিস্ট নেত্রী পূর্ব-পাক-ই-স্তানে সংগঠন করতে সেখানে রয়ে যান! ভাগ্যে জোটে হাজতবাস এবং সেখানে তিনি গণধর্ষণের শিকার হন। শেষমেশ ভারতে ফিরে আসেন এবং কম্যুনিস্ট নেত্রী হয়ে ওঠেন।

আরেক কট্টর "ধর্মনিরপেক্ষ" কম্যুনিস্ট নেতা, যিনি দক্ষিণ কলকাতার রিফিউজি প্রধান এলাকা থেকে জিতে কলকাতা কর্পোরেশানের মেয়র ও পরবর্তীতে এমএলএ ও রাজ্যের মন্ত্রী হয়েছিলেন, তাঁর

পিতৃদেবের কথা বলি। তিনি পূর্ব পাক-ই-স্তানে ইসলামীদের দ্বারা বেষ্টিত হয়ে নিজের কবর নিজে খুঁড়তে বাধ্য হয়েছিলেন এবং সেই কবরে তাঁকে মেরে মাটি চাপা দেওয়া হয়। এই দৃশ্য দেখা সেই ছেলে তাঁর মায়ের নারীত্বের চরম অপমান দেখার পর কলকাতায় এসে কম্যুনিস্ট পার্টিতে এমন শোধন মন্ত্র পেলেন যে, হিন্দু-মুসলিম সম্প্রীতির "ধর্মনিরপেক্ষ" মিছিলের পুরোভাগে থেকে প্রচার চালালেন!

বর্তমান পরিস্থিতিতে দেশে কম্যুনিস্টদের রাজনৈতিক অস্তিত্ব প্রায় বিলীন হলেও তাদের মতের অনুসারী পরবর্তী প্রজন্মের রাজনৈতিক দলগুলি তাদের ভারত বিদ্বেষী নীতি এবং পাক-ই-স্তান প্রেমী দল হিসেবে কিছু আঞ্চলিক দল উঠে এসেছে। এদের মধ্যে অগ্রগণ্য পশ্চিমবঙ্গের তৃণমূল ও উত্তরপ্রদেশের সমাজবাদী দল। একটু লক্ষ্য করলে বোঝা যায়, কম্যুনিস্ট পার্টির প্রাক্তন জেনারেল সেক্রেটারি গঙ্গাধর অধিকারীর তত্ত্ব "union of States" হিসেবে ভারতকে গণ্য করার প্রচেষ্টা এই দলগুলির, বিশেষতঃ কয়েকটি রাজ্যে ক্ষমতায় থাকা এই দলগুলির মধ্যে দেখা যাচ্ছে। আসলে এভাবে সবল রাজ্য ও দুর্বল কেন্দ্রীয় সরকারের প্রতিষ্ঠা হলেই ভারতকে পুনরায় টুকরো করা সহজ হবে।' ভারতের গণতান্ত্রিক পরিকাঠামোর সুযোগ নিয়ে বেড়ে ওঠা এইসব তথাকথিত বিরোধী রাজনৈতিক জোট, যাদের নিজেদের মধ্যে মিলের থেকে অমিল বেশী, তারা এই একটি এ্যাজেন্ডা - দুর্বল কেন্দ্রীয় সরকার তৈরীর লক্ষ্যে - জড়ো হয়েছে!

আমাদের এই উপমহাদেশে ধর্মনিরপেক্ষতা যে একটি কাল্পনিক সম্প্রীতি রক্ষার নামে দুই যুযুধান গোষ্ঠীর মানুষের একদলকে দুর্বল করার চেষ্টা, তা যে জনসাধারণ বুঝতে পারছেন, তাতেই এরা ক্ষিপ্ত হয়ে পড়ছে। যেমন, এক ধর্মে ধর্মান্তর করানোর কর্তব্যের কথা বলা হয়েছে বলে তাকে সমর্থন করা, সেই সঙ্গে অন্য ধর্মের একটি শ্লোকের খন্ডিতাংশকে ব্যবহার করে ভুল বার্তা দেওয়া - এসব বদমায়েশি এরা চালিয়ে যাচ্ছে। শ্লোকটি হল, "অহিংসা পরমো ধর্ম, ধর্ম হিংসা তথৈবচ" ধর্মরক্ষার কারনে অস্ত্র ধরা হিন্দুদের কর্তব্য - একথা মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেব নিজেই বলেছেন।নবদ্বীপের এক কাজীর কৃষ্ণনাম প্রচারে বাধা দেওয়ার কারনে তিনি তাঁর ভক্তদের ঐ কাজীকে সশস্ত্র আক্রমণের উপদেশ দেন। সেই সময় ভক্তদের আক্রমণের ভয়ে কাজী নবদ্বীপ ছেড়ে পালিয়ে যান। শ্রী কৃষ্ণ নিজেই ধর্ম রক্ষার্থে, নারীর সম্মান রক্ষার্থে অস্ত্র ধরার নিদান দিয়েছেন। এগুলোকে এই left eco-system ইচ্ছাকৃতভাবে মানুষকে ভুলিয়ে দেওয়ার চেষ্টা বরাবর চালিয়ে গেছে। এ কারনেই "ধর্মনিরপেক্ষতা"র ব্যবহারিক প্রয়োগে সেটা ইসলামী ধর্মনিরপেক্ষতায় পরিণত হয়েছে।

বিশেষত এই উপমহাদেশে যদি হিন্দু-মুসলমানের সহাবস্থান শান্তিপূর্ণভাবে রাখতে হয়, তাহলে মসজিদ ও বিভিন্ন হুজুর, মৌলানা, মৌলভীদের থেকে ইসলামের অগ্রগতির নামে শুরু থেকেই যে হিংসা ও দখলদারীর সঙ্গে ধর্মান্তরকরনকে ধর্মীয় অনুমোদনের নামে ধর্মীয় অসহিষ্ণুতার চরম সীমায় প্রচার চালানো হয়েছে, তার ফলে, অদুর ভবিষ্যতে দুই ধর্মের মানুষের মধ্যে সৌভ্রাতৃত্ব আসা অবাস্তব। ধর্মনিরপেক্ষতা এই ধর্মীয় ধারক-বাহকদের কাছে হারাম। তা হলে, কি ভাবে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি সম্ভব? আসলে এই ধর্মনিরপেক্ষতার আড়ালে শুধু হিন্দুদের ধর্মের উপর আঘাত করাই নয়, এর উদ্দেশ্য ভারতের গণতান্ত্রিক ভিতকে দুর্বল করে "ভারত তেরে টুকরে হোঙ্গে" নাড়াকে সফল করার সঙ্গে সঙ্গে শেষমেষ দার-উল-হার্বকে দার-উল- ইসলামের দিকে নিয়ে যাওয়া। যে মূহুর্তে তা হবে, ইসলাম কায়েম হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এই কম্যুনিস্টরা ভারত থেকে ভ্যানিশ হয়ে যাবে।

অথচ, আম্বেদকারজী সবিনয়ে দৃঢ়তার সঙ্গে ধর্মনিরপেক্ষতার এবং সমাজতন্ত্রের দাবী খারিজ করেছিলেন। তাঁর বক্তব্য ছিল, ভারতের সংবিধানের দুটি স্তম্ভের একটি হল গণতন্ত্র, অন্যটি সর্বধর্মের সহাবস্থান। সুতরাং, এই Secular কথাটি ভারতের সংবিধানে অবান্তর এবং গণতান্ত্রিক কাঠামোয় সমাজবাদী রাজ্যের সমষ্টি খাপ খায় না। 'গণতান্ত্রিক' কথাটির পরিবর্তন বা লঘুকরন করা সম্ভব নয়। তখনই স্থির হয়ে হয়ে গিয়েছিল, এই কম্যুনিস্ট, জেহাদি এবং তাদের সমর্থক রাজনীতিকরা কিভাবে এগোবে। যখন ভারতের main stream রাজনৈতিক দলের সাহায্য পেয়েছে, তখনই এই জেহাদি, ভারত বিরোধী ও কম্যুনিস্টদের মিলিত আক্রমণে সংবিধানের ধারাগুলির যেমন সংশোধন হয়েছে, তেমন শুরু থেকেই তার ব্যাখ্যা নিজেদের স্বার্থ অনুযায়ী করা হয়েছে। ভারত রাষ্ট্রের ধর্ম সম্পর্কে অবস্থান দ্বিধাহীনভাবে ২৫ নম্বর অনুচ্ছেদে ব্যাখ্যা করা হয়েছে - Freedom of Religion (practice, preach and propagation)। আবার ২৬ নম্বর অনুচ্ছেদে এই ধর্মাচরণ বাধাহীনভাবে করতে দেওয়ার কথা বলা থাকলেও তা শর্তসহ (subject to maintaining Public order, Morality and Health) পালনের অধিকার দেওয়া হয়েছে।

অথচ, ভারতের বিভিন্ন স্থানে যেমন রাস্তা বন্ধ করে বিশেষ ধর্মের মানুষদের প্রার্থনার সুযোগ দেওয়া হয়, এবং কিছু জায়গায় যখন অন্য ধর্মের পুজোর মূর্তি ভাঙ্গা থেকে ধরে ধর্মাচরণে বিভিন্ন বাধা সৃষ্টি করা হয় শুধুমাত্র বাধা সৃষ্টিকারীদের ধর্মের দোহাই দিয়ে, তখন রাজ্য প্রশাসন ও পুলিশ নীরব থাকে সংবিধানের কোন অধিকারে? খোঁজ নিলে দেখা যায় প্রতিটি ক্ষেত্রে এই ভারত বিরোধী শক্তি ও ঐ মানসিকতার রাজনীতিকদের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ মদত থাকে। অনেকসময় এই অশুভ শক্তি দেশের মানুষকে সংবিধানের ২৯ নম্বর অনুচ্ছেদের দোহাই দেয়। দেখা যাক, সেখানে কি আছে - এই অনুচ্ছেদ বলছে, protection of interest of religious

and linguistic minorities. It protects the cultural and educational righrs of these minorities। অর্থাৎ দেশের সংবিধান এক কথা বলছে আর তার নাম করে রাজনৈতিক এবং প্রশাসনিক স্তরে দেশবিরোধী শক্তির সংবিধানের ব্যাখ্যা অন্য রকম হচ্ছে। এটা বন্ধ হওয়া দরকার। এ যেন নিজের জন্মদাত্রীর প্রতি সন্দেহ প্রকাশ করে নিজেকে জারজ ভাবার প্রাণান্তকর প্রচেষ্টা! আমাদের সংবিধান প্রণেতারা এতটাই প্রাজ্ঞ ছিলেন যে, তাঁরা ভবিষ্যতে দেশের সংস্কৃতি, ঐতিহ্য রক্ষার্থে কোন আগ্রাসী হিংসাত্মক ধর্মকে যেমন সাংবিধানিক স্বীকৃতি দেননি, তেমনি তাঁরা linguistic সংখ্যালঘুদের সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য রক্ষার কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করেছেন। অথচ, দেশের সরকার স্থাধীনতা পরবর্তী ৫০ বছর বা তার বেশি সময় ধরে প্রান্তিক বনবাসী মানুষদের বাঁচার রসদটুকু পর্যন্ত আহরণের অধিকার দেননি। সৎনামী সম্প্রদায়ের কৃষ্টি, ঐতিহ্য ও ভাষা রক্ষায় তারা কিছু করেছেন কি? শুধুমাত্র সংবিধানের অপব্যাখ্যা করে বিশেষ ধর্মীয় সম্প্রদায়কে প্রথম শ্রেণীর নাগরিক বানিয়ে, অন্যদের দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিকের পর্যায়ে নামিয়ে এনে তোষণের রাজনীতি করেছেন। এখন সেই সম্প্রদায় রাজনীতিকদের পুরো জমিটাই দখল নিয়ে তাঁদের আস্তাকুঁড়ে ছুঁড়ে ফেলার পরিকল্পনা নিয়ে এগোচ্ছে। সাম্প্রতিক কালের বাংলাদেশের ঘটনায় পর্যন্ত এদের ঘুম ভাঙ্গে না! সত্যি বলতে, এরা জয়চাঁদের DNA নিয়ে মহম্মদ ঘুরীদের সেবায় নিয়োজিত থেকে লুঠেরাবৃত্তিকেই জীবিকা করে চলেছে! আমি সরাসরি এই রাজনীতিক এবং প্রশাসনিক কর্তাদের উদ্দেশ্যে বলি, আপনারা বিশেষ ধর্মের মানষদের শুধু সংখ্যালঘু বানিয়ে তাদের 'সংখ্যালঘু' তকমা দিয়ে যে সুযোগ সুবিধা দিয়ে চলেছেন, তার সাংবিধানিক স্বীকৃতি কোথায়?

সংবিধানে কখনো বলা হয়নি যে একটি বিশেষ ধর্মের মানুষরা যারা দেশের দ্বিতীয় বৃহত্তম সংখ্যাগুরু, অঞ্চল বিশেষে তারা ধর্মীয় সংখ্যাগুরু, তারা দেশের সর্বত্র 'সংখ্যালঘু' তকমা নিয়ে বিশেষ সুবিধা ভোগ করবে। সুতরাং আইনত এবং সাংবিধানিক স্বীকৃতি এই সুবিধা দেওয়ার পক্ষে নয়। প্রশাসন ভবিষ্যতে কি করবে তা তাদের ব্যাপার। তবে, একথাটা বলা ভালো যে এই সুবিধা প্রদান শুধু অসাংবিধানিক নয়, স্বাভাবিকভাবে দেশের fundamental rights-কে লঙ্ঘন করছে। এইভাবে এক বিশেষ ধর্মীয় গোষ্ঠী, যাদের নেতৃবৃন্দ সুযোগের অপেক্ষা করছে, কখন দার-উল-হার্বকে দার-উল-ইসলামে রূপান্তরিত করা যায়, তারা এখন দেশের কিছু বিরোধী দলের মদতে সক্রিয় হয়ে উঠেছে। তাদের উদ্দেশ্য এই একটাই। পুরো উপমহাদেশে তাদের ধর্মীয় শাসন চালু করা। এ বিষয়ে তারা যেমন অন্য ধর্মের নির্বোধদের সাহায্য নেবে, তেমনি নিজ ধর্মের শান্তিপ্রিয় মানুষদের বাধা পেলে তাদেরও নিকেশ করতে ছাড়বে না। এর প্রকৃষ্ট প্রমান সাম্প্রতিক বাংলাদেশ। এ ধরনের আগ্রাসী ধর্মভিত্তিক রাজনৈতিক আগ্রাসনকে যারা সমর্থন করছে, হয় তারা এদের উদ্দেশ্যের সঙ্গে একাত্ম অথবা তারা নির্বোধের মত নিজের ঘরে আগুন লাগাচ্ছে। এভাবে ভারতের কম্যুনিস্টরা নিজেদের দেশেই অপ্রাসঙ্গিক রাজনৈতিক শক্তি। তারা অন্যের উচ্ছিষ্টভোগী হয়ে রাজনৈতিক অস্তিত্ব বজায় রেখেছে মাত্র। আসলে ভারত রাষ্ট্রকে যারা প্রথম দিন থেকেই একটি রাষ্ট্র হিসেবে স্বীকার করেনি, তারাই অধুনা এই ধরনের রাজনৈতিক হারাকিরিতে লিপ্ত হয়েছে। কারন ভারত রাষ্ট্র নিয়ে কখনই তাদের কোনও ধারনা না থাকায় জাতীয়তাবোধও তাদের ধারনার বাইরে।

সংবিধানের ১৫ নম্বর অনুচ্ছেদ অনুযায়ী "The State shall not deny to any person equality before the law or the equal protection of laws within the territory"। এই ধারা অনুযায়ী অন্যদের বঞ্চিত করে ধর্মীয়, অর্থনৈতিক ও সামাজিক সুবিধা শুধুমাত্র বিশেষ ধর্মের তথাকথিত 'সংখ্যালঘু' মানুষদের দেওয়া যায় কি? এই প্রশ্নের জবাব পাওয়া যায় না। ধর্মাচরনের নামে সমাজের অন্য কারো অসুবিধা করা সংবিধান বিরোধী। কিন্তু দেশের বিশেষ কিছু অঞ্চলে ধর্মের দোহাই দিয়ে মূর্তি পুজোয় বাধা দেওয়া এবং পুজো নষ্ট করার অভিযোগ পাওয়ার পর প্রশাসন ও পুলিশ যখন কার্যকরী পদক্ষেপ নিতে পারে না, তখন সন্দেহ জাগে, আদৌ আমাদের দেশ কি ধর্মনিরপেক্ষ নাকি তারা ইসলাম মেনে ধর্মনিরপেক্ষ অর্থাৎ ইসলামী ধর্মনিরপেক্ষ!

একটা ব্যাপার খুব পরিষ্কার। গত বৎসরাধিক সময় দেশের যেখানে যেখানে নির্বাচন হয়েছে, সেখানে আমাদের সংবিধানের ভুল ব্যাখ্যা দিয়ে বিশেষ সুবিধা পাওয়া একটি ধর্মের মানুষজন লক্ষণীয়ভাবে bulk voting করেছেন। সংবিধান অনুযায়ী এই ভোট কিন্তু মুক্ত (free) ভোটের পরিচয় নয়। অর্থাৎ বোঝা যাচ্ছে, ১৯৪৭ সালে ভারতে থেকে যাওয়া দেওবন্দী নেতারা তাদের চিন্তাধারা সমধর্মাবলম্বী মানুষদের মধ্যে ছড়িয়ে দিতে সমর্থ হয়েছে। পক্ষান্তরে এই ধর্মীয় মুখোশের আড়ালে থাকা মুখগুলির রাজনৈতিক উদ্দেশ্য বুঝতে দেশের বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলি চরম ব্যর্থ। সংবিধানের বিভিন্ন অনুচ্ছেদের ভুল ব্যাখ্যা, directive principle এর অপব্যবহার দেশের স্থায়ীত্বের পক্ষে সংকট সৃষ্টি করছে। দেশের অভ্যন্তরে থেকে সংবিধানের ভুল ব্যাখ্যা করে freedom of speech এর নামে উগ্রবাদী এবং বিচ্ছিন্নতাবাদীদের সমর্থন করে কিছু রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ দেশ বিরোধী রাজনীতি করছেন। তাতে উদ্ভুদ্ধ হয়ে বাংলাদেশের জেহাদি বাহিনী প্রমাণ করে দিয়েছে, এদের সঙ্গে অন্য ধর্মের মানুষের সহাবস্থান অসম্ভব।

পরিশেষে বলি, উপমহাদেশের বর্তমান পরিস্থিতিতে দেশের মধ্যে ধর্মীয় মৌলবাদী এবং বিচ্ছিন্নতাবাদীদের সংবিধানের ভুল ব্যাখ্যা করে রাজনৈতিক ফয়দা তুলতে দিলে তা দেশের অখন্ডতার পক্ষে সবচেয়ে বড় বিপদ। বিরোধী রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ এ কথা যত তাড়াতাড়ি বোঝেন ততই মঙ্গল।

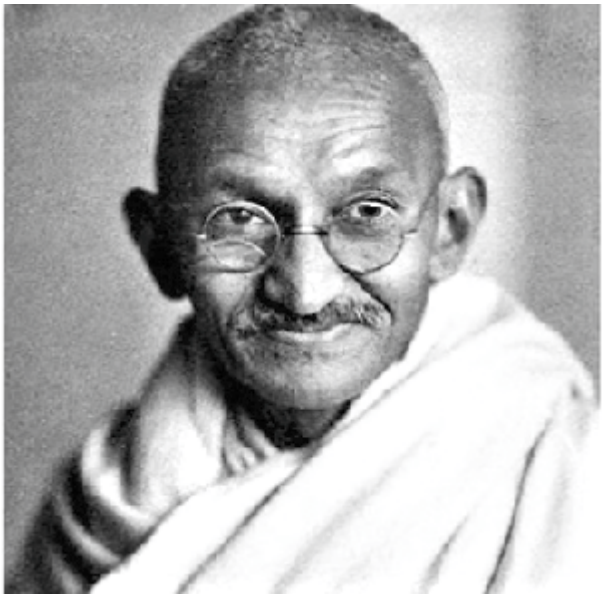

আম্বেদকরকে নিয়ে কংগ্রেসের অভিনয়

মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী এবং ভীমরাও রামজি আম্বেদকরের প্রসঙ্গ

পুলক নারায়ণ ধর

ডঃ আম্বেদকর কি গান্ধীজি এবং কংগ্রেসের কাছ থেকে তাঁর প্রাপ্য সম্মান পেয়েছিলেন? নাকি কংগ্রেস এবং গান্ধীজি বুঝতে পারেনি ডঃ আম্বেদকরকে? নাকি বোঝার চেষ্টাই করেনি?

ভারতের সংবিধান রচয়িতাদের মধ্যে অন্যতম প্রধান ব্যক্তি ছিলেন ডঃ ভীমরাও আম্বেদকর। জাতিতে মাহার। অস্পৃশ্য জাতি হিসেবে যুগ যুগ ধরে অপমানিত ও নির্যাতিতদের প্রতিনিধি। আম্বেদকর উপাধি তার প্রাপ্ত উপাধি। গোড়াতে অনেকেই তাকে ব্রাহ্মণ সম্প্রদায় ভুক্ত বলে ধারণা করেছিলেন।

গান্ধীজির সঙ্গে আম্বেদকরের শ্রদ্ধা-ভক্তির সম্পর্ক ছিলনা। রাজনীতিতে গান্ধী-আম্বেদকর এবং কংগ্রেস দলের মধ্যে কোন মিতালীর সম্পর্ক গড়ে ওঠেনি। কংগ্রেস রাজনীতিতে আম্বেদকর ছিলেন বেমানান ব্যক্তিত্ব। সেখানেও অদৃশ্য অস্পৃশ্য তার আবরণ। স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাসে তাই আম্বেদকরের নাম তেমনভাবে আলোচিত হয় না। তাঁকে স্বাধীনতা উত্তর পর্বে ভারতের সংবিধান রচনার অন্যতম একজন হিসেবেই স্থান দেওয়া হয় অর্থাৎ রাজনৈতিক বা সামাজিক আন্দোলনের সঙ্গে তাঁর ভূমিকাকে হালকা করে দেখিয়ে সংবিধান রচনার ক্ষেত্রে একজন বড় কেরানির ভূমিকাতেই তাকে আবদ্ধ করে রাখা হয়েছে। শুধুমাত্র তাঁর এই পরিচয়কেই গৌরব গানের অভিনয় করে বর্ণনা করা হয় ভারতের সংবিধানের জনক (father of the Indian Constitution) হিসাবে।

সত্যের খাতিরে তাঁর প্রতি পূর্ণ শ্রদ্ধা জানিয়ে বলতে হবে যে ভারতের সংবিধান রচনার ক্ষেত্রে তিনি একমাত্র ব্যক্তি ছিলেন না। সংবিধান রচনার জন্য আরও পাঁচজনের মধ্যে তিনি ছিলেন মধ্যমণি। তিনি ছিলেন ড্রাফটিং কমিটির চেয়ারম্যান। সংবিধান একটি রাজনৈতিক ও সামাজিক দলিল। সংবিধানকে শুধু কতগুলি আইনের সংকলন হিসেবে ভাবলে ভুল হবে। এর একটা দর্শন আছে উদ্দেশ্য আছে এবং ভবিষ্যৎমুখী ভাবনাচিন্তা আছে যা বিভিন্ন আইনের শব্দে বাঁধা হয়েছে। সংবিধান শুধু 'Fundamental Law' নয়। সংবিধান স্বাধীনতা, সাম্য ও ভ্রাতৃত্বের ঘোষণা। এই দর্শন রচনার পিছনে ছিলেন Constituent Assembly-র বহু পন্ডিত ও উচ্চ চিন্তাভাবনা সম্পন্ন ব্যক্তি এবং রাজনৈতিক নেতৃবর্গ। সংবিধান দেশ ও জাতির একটি শ্রেষ্ঠ দিগনির্দেশ। এটা কোন নিছক উকিলী দলিল নয়। এই দর্শন ও ব্যক্তি স্বাধীনতার আদর্শকে আইনের রূপ দিয়েছিলেন প্রধানত ভীমরাও আম্বেদকর। এ বিষয়ে আম্বেদকারের দক্ষতা ছিল তুলনাহীন।

কিন্তু শুধুমাত্র এই গণ্ডির মধ্যেই আম্বেদকর সীমাবদ্ধ ছিলেন না। যদিও আম্বেদকর সম্বন্ধে এই ধরনের ধারণা পাঠ্যপুস্তকগুলিতে দেখানো হয়। তা

অত্যন্ত ভ্রান্ত। তাঁর কর্মক্ষেত্র, দর্শন ও সংগ্রামের কাহিনী ছিল সুবিস্তৃত এবং ভারতের রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে সম্পূর্ণ ভিন্ন যা ভারতবাসীকে বোঝানো হয়না।

গান্ধীর সঙ্গে আম্বেদকরের প্রথম সাক্ষাৎ হয় মালাবার হিলের মণিভবনে। ১৯৩১ সালের ১৪ আগস্ট। সেই সময়ে গান্ধীজি, আম্বেদকরের কথাবার্তা আদৌ প্রীতিকর মনে করেননি। কংগ্রেস ও দেশের সর্বময় রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব হিসেবে গান্ধীজিকে এত কথা আগে কখনো শুনতে হয়নি। গান্ধীজির পক্ষে সেইসব কটু কথা হজম করাও বেশ কঠিন ছিল। তিনি বলেন যে আম্বেদকরের জন্মের আগে থেকেই তিনি অস্পৃশ্যতার বিরুদ্ধে আন্দোলন করছেন এবং কংগ্রেসের কর্মসূচিতেই এই বিষয়টিকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। তিনি আরও জানান যে কংগ্রেস দলিতদের জন্য কুড়ি লক্ষ টাকা খরচ করেছে। সুতরাং কোন যুক্তিতে আম্বেদকর গান্ধীজির এবং কংগ্রেসের বিরোধিতা করছেন। এই বক্তব্যের উত্তরে আম্বেদকর বলেছিলেন যে অন্যান্য প্রবীনদের মতন গান্ধীজিও বয়সের গুরুত্বের উপর জোর দিচ্ছেন। কিন্তু বাস্তবে কংগ্রেস অস্পৃশ্যদের জন্য কিছুই করেনি। কংগ্রেস যে ২০ লক্ষ টাকা খরচ করেছে বলে গান্ধীজি বলছেন তা অপচয় হয়েছে মাত্র। এই অর্থ গরিবদের উন্নয়নের প্রকল্পে ব্যয় করার আগে যদি তার সঙ্গে আলোচনা করতেন (গান্ধীজি) তাহলে অনেক উন্নতির পথ তিনি দেখাতে পারতেন। কংগ্রেস তার কর্মসূচিতে আদৌ নিষ্ঠাবান নয়।

আম্বেদকর আরও বলেন যে খদ্দর পরিধান করার মতন শর্ত যদি কংগ্রেস সদস্যদের জন্য থাকে তাহলে দলিতদের সঙ্গে ও অস্পৃশ্যদের সঙ্গে সপ্তাহে একদিন আহার করার শর্তও কংগ্রেস রাখতে পারত। তাছাড়া দলিত বা অস্পৃশ্য ব্যাক্তিকে বাড়ির কাজে নিয়োগ করাও, কংগ্রেসের সদস্যপদ গ্রহণ করার বা লাভ করার শর্ত হিসাবে কংগ্রেস রাখতে পারতো। সেক্ষেত্রে কংগ্রেসের আন্তরিকতা ও নিষ্ঠার পরিচয় পাওয়া যেত। আম্বেদকর বলেন কংগ্রেসের জেলার নেতারা অস্পৃশ্যদের মন্দিরে প্রবেশে নিয়ে আন্দোলনের বিরোধিতা করে চলেছে আর আপনি কর্মসূচির কথা বলছেন, এটা খুবই হাস্যকর। আম্বেদকর গান্ধীজির মুখের ওপর বলেছিলেন, "আপনি বলতে পারেন যে কংগ্রেস শক্তি চায়, সেজন্য এমন শর্ত রাখা বোকামি। তাহলে আমার বক্তব্য, নীতির চেয়ে শক্তি বেশি চায় আপনার কংগ্রেস। এবং কংগ্রেসের বিরুদ্ধে এটাই আমার অভিযোগ।" আম্বেদকর গান্ধীজীর কাছে জানতে চেয়েছিলেন, "কংগ্রেসের লোকেরা কেন আমাদের আন্দোলনে বাধার সৃষ্টি করেন এবং বিশ্বাসঘাতক বলেন?" এরপর আম্বেদকর এক শক্তিশেল নিক্ষেপ করে বলেন, "History tells me that Mahatmas like fleeting phantoms raise dust but raise no level .... How can I call this land my own homeland and religion my own wherein we are treated worse than cats and dogs wherein we cannot get water to drink?"১

আসলে আম্বেদকর শুরু থেকেই ছিলেন কংগ্রেস দলের বিরোধী। কংগ্রেসের নেতৃত্বে দলিল ও অস্পৃশ্য শ্রেণীর মানুষের কোন উন্নতি ঘটবে না, এটাই ছিল তার দৃঢ় বিশ্বাস। তিনি কংগ্রেসের ওপর নির্ভর না করে স্বাধীনভাবে নিজেদের আন্দোলন ও সংগ্রাম গড়ে তোলার পরামর্শ দেন। আম্বেদকরের সঙ্গে গান্ধীজির প্রথম সাক্ষাতের সময় থেকে যে বিরোধিতা শুরু হয় তা কোনদিন শেষ হয়নি। আম্বেদকর সম্বন্ধে কৌতুহলী হয়ে এবং তাঁদের দলে যোগ দেওয়ার উদ্দেশ্য নিয়ে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলেন এম এন রায়। তিনি ডক্টর মাহমুদ ছদ্ম নামে তাঁর সঙ্গে বোম্বাইয়ে এসে দেখা করেছিলেন। আম্বেদকর এই ডক্টর মাহমুদ তথা এম এন রায়ের সঙ্গে কথাবার্তা বলে আদৌ প্রভাবিত হননি। তাঁর মনে হয়েছিল এই মাহমুদ বা এম এন রায় দলিত সম্প্রদায়ের মানুষ সম্পর্কে এবং তাঁদের সমস্যার সম্পর্কে আদৌ কিছু বোঝার চেষ্টা করেননি বা জানেন না।

ডঃ আম্বেদকর, ১৯৫৫

এইভাবে আম্বেদকর একদিকে গান্ধীজির পরোক্ষ আক্রমণের লক্ষ্যবস্তু হয়ে গেলেন। পাশাপাশি কমিউনিস্টরাও তাঁকে খুব একটা গুরুত্বপূর্ণ নেতা হিসাবে মনে করতেন না। কিন্তু দলিত মানুষদের মধ্যে আম্বেদকারের গ্রহণযোগ্যতা ক্রমশই লক্ষ্য করা গেল। কংগ্রেস এবং গান্ধীজির কাছে এই উদীয়মান নেতার অস্তিত্ব বিপজ্জনক বলে মনে হল। গান্ধীজি আম্বেদকরকে কখনোই তাঁর বশে আনতে পারেননি। তাঁর 'কারিশমা'-ও আম্বেদকরের উপর কোন

ছায়াপাত করেনি। আম্বেদকর কখনো গান্ধীজিকে মহাত্মা নামে অভিহিত করেননি, যেমন মোহাম্মদ আলী জিন্নাও করেননি। তিনিও গান্ধীজিকে মিস্টার গান্ধী বলেই সম্বোধন করতেন।

আম্বেদকরের গান্ধী বিরোধিতার মধ্যে ছিল, বর্ণ হিন্দুদের বা সার্বিকভাবে হিন্দুদের - অস্পৃশ্যদের প্রতি ঘৃণা ও অবজ্ঞার কারণ। গান্ধী সম্বন্ধে তাঁর ধারণা ছিল যে গান্ধী দ্বিচারিতার আশ্রয় গ্রহণ করেন। হঠাৎ হঠাৎ ঈশ্বরের ডাকে আন্দোলন। আবার হঠাৎ করেই ঈশ্বরের ডাকে আন্দোলন প্রত্যাহার করেন। ভগবানের আহ্বানেই তিনি ২১ দিনের অনুষ্ঠানে বসেন অস্পৃশ্যদের উন্নতির জন্য ৮ মে। পুলিশ তাঁকে গ্রেফতার করে তুলে নিয়ে যায়। বিকেলে তাকে মুক্তি দেওয়া হল। তিনি স্থানান্তরিত হলেন লেডি থ্যাকারস-এর প্রাসাদে এবং অনশন ভঙ্গ করলেন। সুভাষচন্দ্র বসু তখন অসুস্থ হয়ে বিদেশে ছিলেন। ভিয়েনা থেকে গান্ধীজির কাজের তিনি সমালোচনা করেন। রাজনৈতিক নেতা হিসাবে গান্ধীজিকে সুভাষচন্দ্র ব্যর্থ নেতা বলে অভিহিত করেন। গান্ধীজিকে একই কারণে আম্বেদকরও ব্যর্থ নেতা বলেই মনে করতেন। এবং একই কারণে গান্ধীজি, সুভাষচন্দ্র ও আম্বেদকরকে কোনদিন ক্ষমা করতে পারেননি।

জাতিভেদ প্রথা যুগ যুগ ধরে চলে আসা একটা প্রথা। কারও পক্ষেই তা একদিনে বা একটি স্লোগান দিয়ে দূর করা সম্ভব নয়। গান্ধীজি তাঁর শক্তি নিয়োগ করেছিলেন শুধু বাক্যবিস্তারে ও উপদেশ প্রদানে। কার্যকর কোন পন্থা গ্রহণ করতে তিনি পারেননি। স্যার যদুনাথ সরকারের মতে "Caste grows by fusion. It is antagonistic to national union". আমাদের স্বাধীনতা আন্দোলনের ক্ষেত্রে এই জাতি ভেদ প্রথা ছিল একটি বড় বাধা। হিন্দু মুসলমান সাম্প্রদায়িক সমস্যা বা হিন্দুদের জাতিভেদ প্রথা বিষয়ে গান্ধীজির কোন বাস্তব ফর্মুলা ছিল না। জাতীয় ঐক্যসাধনে এর খুবই প্রয়োজন ছিল। আম্বেদকরের পক্ষেও জাতিভেদ প্রথার বিলুপ্তি ঘটানো তাঁর ক্ষমতার নাগালের অনেক বাইরে ছিল। কিন্তু বিষন্ন দলিত মানুষের সম্মান ও অধিকারের জন্য আম্বেদকরের যে সীমাবদ্ধ ফর্মুলা ছিল তা তিনি গান্ধীজি ও ইংরেজ শাসককে গ্রহণ করতে বাধ্য করেছিলেন। তাতে জাতি গুলির মধ্যে অনৈক্য বিরোধী কিছু গণতান্ত্রিক নিয়ম প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। কিন্তু তা ছিল সাময়িক। এর ফলে জাতি ভেদ দূর না হয়ে নতুন করে রাজনৈতিকভাবে প্রতিষ্ঠা পেল।

বর্তমানে সংবিধানে সংরক্ষণ নীতির ফলে তা আরো সুদূরপ্রসারী নেতিবাচক ফল দিতে শুরু করেছে। বলতেই হবে যে গান্ধীজি বা আম্বেদকর কেউই কোন ইতিবাচক বিষয় স্থাপন করতে পারেননি। এটাও বলতে হবে যে গান্ধীজির ব্যর্থতাই আম্বেদকরের উত্থানের সোপান তৈরি করেছিল এবং আম্বেদকর সংবিধানে এই প্রসঙ্গটি জুড়ে দিয়ে দলিত শ্রেণির খুব একটা উন্নতি ঘটাতে পারেননি। গান্ধীজি এবং আম্বেদকর এই প্রসঙ্গে বিপরীত মেরুতে অবস্থান করলেও ফলাফলের বিচারে একই জায়গায় দাঁড়িয়ে আছেন।

আম্বেদকর অনুভব করেছিলেন যে তাঁদের দাসত্ব, বর্ণ হিন্দু নেতাদের উপর নির্ভর করে মানুষ বুঝবে না। তাঁর ভাষায় "We feel nobody can remove our grievances as well as we can and we cannot remove them unless we get political powers in our own hands." এইভাবে আম্বেদকর গান্ধীজি ও কংগ্রেসের নেতৃত্বকে চরম চ্যালেঞ্জের মুখে ফেলে দিয়েছিলেন। গান্ধীজির প্রকৃত বিরোধী ছিলেন আম্বেদকর। Round Table Conference-এ গান্ধীজির ভূমিকা আম্বেদকরকে এ বিষয়ে আরো সন্দিগ্ধ করে তোলে। গান্ধী সেখানে তাঁর প্রিয় বিষয় হিন্দু মুসলিম সম্পর্ক নিয়ে বড় করে বলতে থাকেন। অস্পৃশ্যদের প্রসঙ্গে তিনি বলেন আমি আম্বেদকরের সঙ্গে এ বিষয়ে নিয়ে আলোচনা করবেন। কিন্তু নিজে রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠার জন্য বা প্রতিনিধিত্বের জন্য বিশেষ কিছুই বললেন না। তিনি বললেন আম্বেদকরের বক্তব্য তিনি বুঝে উঠতে পারছেন না।

শেষ পর্যন্ত ভারতের মাটিতে আম্বেদকরের সঙ্গে পুনা চুক্তি (১৯৩২) হয়েছে। দু'জনের আধা আধি জয় পরাজয় হোল। জিন্নার কাছেও গান্ধীজি এত অপমানিত বোধ করেননি, যতটা ভারতীয় রাজনীতিতে অপেক্ষাকৃত সামান্য ব্যক্তির কাছে হয়েছিলেন।

আশ্চর্য এই যে এই কংগ্রেসিরা আজ আম্বেদকরকে নিয়ে এত মাতামাতি করছে সস্তার রাজনৈতিক উদ্দেশ্যসাধনে, তাদের পুরনো কীর্তিকলাপ যদি তারা আজ একটু স্মরণ করে তাহলে লজ্জায় তাদের মাথা হেট হয়ে যাবার কথা। এসব ইতিহাস এরা মনে রাখতে চায় না। ভুলে গেছে। আজ তারা যেটা করছে সেটা সেই আদি নেতার মতনই পাতানো গান্ধীর মেকি সর্বস্বতা ভিন্ন কিছু নয়।

তথ্যসূত্রঃ

১। Dr. Bhimrao Ramji Ambedkar: Life and Mission, a book by Dhananjay Keer, Popular Prakasan, Bombay, 1954, Page (165-166)

কমিউনিজম এবং ডঃ আম্বেদকর

দেবতনু ভট্টাচার্য্য

ডঃ আম্বেদকর বিশ্বাস করতেন যে মার্ক্সবাদের জন্মের বহু বহু আগেই ভারতে সমাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা করতে পেরেছিলেন বুদ্ধদেব এবং সেটাও কোনও হিংসা, রক্তক্ষয়, ধ্বংস অথবা একনায়কতন্ত্র ছাড়াই। তিনি ছিলেন আদ্যোপান্ত ধর্মবিশ্বাসী এবং ধর্মকে আফিম বলে মনে করা কমিউনিস্টদের তিনি ঘৃণা করতেন।

হিন্দু সমাজের ঐক্য এবং এই ঐক্যের রাজনৈতিক প্রতিফলনই এখন হিন্দুর শত্রুদের সবথেকে বড় মাথাব্যথার কারণ। রাজনীতির ক্ষেত্রে যে একটা ধর্মীয় মেরুকরণ হয়েছে এই বাস্তবতাকে আজ কেউ অস্বীকার করতে পারবে না। কংগ্রেস,বামপন্থী এবং স্বার্থান্বেষী কয়েকটি আঞ্চলিক দল মিলে যে ইন্ডি জোট তৈরি হয়েছে, এই ধর্মীয় মেরুকরণের ফলে এদের পিন্ডি চটকে গেছে। বিজেপিকে কেন্দ্র করে হিন্দু জাতীয়তাবাদী সমাজের কনসলিডেশনের ফলস্বরূপ এরা আজ দিশাহারা। এই অপ্রত্যাশিত প্রতিকূল পরিস্থিতিতে এদের ভারত বিরোধী এবং হিন্দু বিরোধী গোপন এজেন্ডা এখন খোলস ছেড়ে বেরোতে শুরু করেছে। এতদিন পর্যন্ত ধর্মনিরপেক্ষতার রঙিন চশমা পরিয়ে এবং হিন্দু সন্ত্রাসবাদের নামে একটা মিথ্যা আতংক তৈরি করে এরা ভারতের শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষকে বিভ্রান্ত করে রেখেছিল। কিন্তু ইন্টারনেটের যুগে সত্যকে বেশিদিন লুকিয়ে রাখা সম্ভব নয়। এদের ধর্মনিরপেক্ষতা যে আসলে হিন্দু-বিরোধিতা এবং মুসলিম তোষণের পোশাকি নাম সেটা আজ সবাই বুঝতে পেরেছে। পাশাপাশি হিন্দু সন্ত্রাসবাদের মিথ যে আসলে দেশের ভিতরের ও বাইরের ভারত বিরোধী এবং হিন্দু বিরোধী শক্তিগুলোর সেট করা ন্যারেটিভ- সেটা আজ জলের মত পরিষ্কার। যারা এদেশে দেশপ্রমিক জাতিয়তাবাদী শক্তির উত্থান চায় না, ভারতে প্রকৃত ভারতীয়দের শাসন চায় না, বরং নিজেদের হাতের পুতুল কিছু পেটোয়া দালালকে ক্ষমতায় বসিয়ে বাস্তবে ভারতকে পদানত করে রাখতে চায়, সেই সমস্ত ভারত বিরোধী শক্তিগুলোর অঙ্গুলি হেলনে এদেশে রাজনৈতিক ন্যারেটিভ তৈরি হচ্ছে এটা আজকে ওপেন সিক্রেট।

এরা নিশ্চিত যে ভারতকে দুর্বল করতে হলে, ভারতের অগ্রগতিকে প্রতিহত করতে হলে মোদীকে, বিজেপিকে শাসন ক্ষমতায় থাকতে দেওয়া যাবে না। এটা তখনই সম্ভব হবে, যখন হিন্দু সমাজে গড়ে ওঠা এই ঐক্যকে ভাঙা যাবে। তাই এদের অন্যতম হাতিয়ার হল কাস্ট পলিটিক্স। আর কাস্ট পলিটিক্স করতে হলে আম্বেদকরের নাম এবং ছবি সামনে রাখতেই হবে। তাই আম্বেদকরকে সামনে রেখে, তথ্য গোপন করে অথবা তথ্য বিকৃত করে হিন্দু বিরোধী, বিজেপি বিরোধী ন্যারেটিভ নামানোর কাজ চলছে। এই কাজে প্রধানত বামপন্থীরাই

সামনের সারিতে। অতিবাম নেতা আনন্দ তেলতুম্বডে 'বি আর আম্বেদকর: ইন্ডিয়া এন্ড কমিউনিজম' বইয়ের মুখবন্ধে অনেক যুক্তি খাড়া করার চেষ্টা করেছেন যে ডঃ আম্বেদকর মার্ক্সবাদের বিরোধী ছিলেন না। তপশিলি সমাজের মধ্যে এই তত্বকে প্রতিষ্ঠিত করে তাদেরকে হিন্দু জাতীয়তাবাদী রাজনৈতিক স্রোত থেকে বিচ্ছিন্ন করার একটা মরিয়া চেষ্টা চালাচ্ছে তারা। কিন্তু ডঃ আম্বেদকর মার্ক্সবাদের মৈলিক তত্ব এবং তার বাস্তবায়নের পথের সাথে সম্পূর্ণ ভিন্ন মত পোষণ করতেন এই সত্য সবার সামনে আসা দরকার। পাশাপাশি মার্ক্সবাদীরাও ডঃ আম্বেদকরকে শত্রু মনে করতেন এবং বারবার মার্ক্সবাদীদের সাথে তার মতবিরোধ হয়েছে। মার্ক্সবাদীরা কিভাবে বিভিন্ন ক্ষেত্রে তাঁর বিরোধিতা করেছে সেই সত্যও সামনে আসা দরকার।

মার্ক্সবাদ প্রসঙ্গে ডঃ আম্বেদকর বলেছেন, "বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র দ্বারা কার্ল মার্কস যা বোঝাতে চেয়েছিলেন তা হল তার সমাজতন্ত্রের ব্র্যান্ডের সাফল্য অনিবার্য এবং অপরিহার্য। মনুষ্য সমাজ তার দিকে অগ্রসর হচ্ছে এবং কিছুই এর অগ্রগতিকে আটকাতে পারবে না (Buddha Or Karl Marx, page-11)।···. মার্ক্সবাদের তত্ব সামনে আসার পর থেকেই এর প্রচুর সমালোচনা হয়েছে। এর ফলস্বরূপ মার্ক্সের মূল তাত্বিক বিচারধারা ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে গিয়েছে। এই বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই যে মার্ক্সবাদীদের সমাজতান্ত্রিক ব্র্যান্ডের অনিবার্যতার দাবী সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ হয়েছে (Buddha Or Karl Marx, page-13)"।

রাশিয়ায় কমিউনিজমের প্রতিষ্ঠার প্রসঙ্গে ডঃ আম্বেদকরের অভিমত, "দাস ক্যাপিটালের প্রথম প্রকাশনার ৭০ বছর পরে কোনও একটা দেশে কমিউনিজম প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এটা কোনও রকম মানবিক প্রচেষ্টা ছাড়াই স্বাভাবিক ভাবে 'অনিবার্য' রূপে আসে নি। সেখানে সুপরিকল্পিতভাবে একটা বিপ্লব সংঘটিত করা হয়েছিল এবং এতে প্রচুর হিংসা ও রক্তক্ষয়ও হয়েছিল।··· সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার অনিবার্যতার মিথ্যা তত্ব ছাড়াও মার্ক্সবাদের অনেক প্রস্তাবই যুক্তি এবং বাস্তব অভিজ্ঞতার কষ্টিপাথরে নস্যাৎ হয়ে গিয়েছে। ···(যেমন) ইতিহাসের অর্থনৈতিক পরিভাষাই যে ইতিহাসের একমাত্র ব্যাখ্যা- একথা কারও কাছেই গ্রহণযোগ্য নয়। কমিউনিজম প্রতিষ্ঠার ফলে সর্বহারা শ্রেণী ক্রমশ শেষ হয়ে গিয়েছে, একথাও গ্রহণযোগ্য নয়"। (Buddha Or Karl Marx, page-14)

ডঃ আম্বেদকর বুদ্ধের মতবাদ এবং মার্ক্সবাদের তুলনামূলক পর্যালোচনা করতে গিয়ে বলেছেন, " এটা স্পষ্ট যে বুদ্ধ দ্বারা গৃহীত উপায়গুলি ছিল একজন মানুষকে তার নৈতিক স্বভাব পরিবর্তন করে স্বেচ্ছায় সেই পথে চলার জন্য রূপান্তরিত করা। পাশাপাশি মার্ক্সবাদীদের গৃহীত পথ হল হিংসা এবং সর্বহারার একনায়কতন্ত্র"। (Buddha Or Karl Marx, page-24)

'বুদ্ধ না কার্ল মার্ক্স'-বিখ্যাত সেই ভাষণ দিচ্ছেন ডঃ আম্বেদকর।

হিংসা এবং ধ্বংসের মার্ক্সিয় পথের কঠোর সমালোচনা করে তিনি প্রশ্ন তুলেছেন, "কমিউনিস্টরা কি বলতে পারে যে তাদের মূল্যবান সাফল্য অর্জনে তারা অন্য মূল্যবান উদ্দেশ্যগুলিকে ধ্বংস করেনি? তারা ব্যক্তিগত সম্পত্তি ধ্বংস করেছে। এটাকে যদি একটা সাফল্য বলে মনে করা হয়, তারা কি বলতে পারে যে তারা এই সাফল্য অর্জনের প্রক্রিয়ায় অন্য মূল্যবান জিনিষকে ধ্বংস করেনি? কত মানুষকে তারা হত্যা করেছে তাদের মতকে প্রতিষ্টা করার জন্য। তাদের কাছে মানুষের জীবনের কি কোনও মূল্য নেই? (Buddha Or Karl Marx, page-29)"

মার্ক্সবাদের সমালোচনা করে তিনি বলেছেন, "কমিউনিস্টরা স্বয়ং স্বীকার করে যে, স্থায়ী একনায়কতন্ত্র ভিত্তিক রাষ্ট্রের তত্ব তাদের রাজনৈতিক দর্শনের দুর্বলতা। তারা দাবি করে যে রাষ্ট্রব্যবস্থা শেষ পর্যন্ত বিলীন হয়ে যাবে। এই প্রসঙ্গে দুটি প্রশ্ন আছে, যার উত্তর তাদের দিতে হবে। কখন রাষ্ট্রব্যবস্থা বিলীন হয়ে যাবে? রাষ্ট্রব্যবস্থা বিলীন হয়ে গেলে তার স্থানে বিকল্প ব্যবস্থা কী হবে? ··· এর ফলে কি নৈরাজ্য সৃষ্টি হবে?···এই প্রশ্নগুলির কোনও সুস্পষ্ট উত্তর কমিউনিস্টদের কাছে নেই (Buddha Or Karl Marx, page-43)"।

তাঁর স্পষ্ট মত ছিল এই যে সমাজতন্ত্র একমাত্র প্রতিষ্ঠিত হতে পারে ধর্মের ভিত্তিতে, মার্ক্সের পথে নয়। কারণ, "মানবতা শুধু অর্থনৈতিক মূল্যবোধ চায় না। মানবতা আধ্যাত্মিক মূল্যবোধ বজায় রাখতে চায়। ···. কার্লাইল পলিটিক্যাল ইকোনমিকে 'পিগ ফিলসফি' বলে আখ্যায়িত করেছেন।··· মানুষের জন্য বস্তুগত আরামের প্রয়োজন আছে কিন্তু মার্ক্সবাদ এই জন্যই ভুল বলে মনে হয় যে এই দর্শনের বস্তুতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গীতে মানুষ আর শূকরের মধ্যে বিশেষ পার্থক্য নেই। মানুষকে বস্তুতান্ত্রিক জীবনধারার পাশাপাশি আধ্যাত্মিকভাবেও বেড়ে উঠতে হবে" (Buddha Or Karl Marx, page-48)।

বাবাসাহেব বিশ্বাস করতেন যে মার্ক্সবাদের জন্মের বহু বহু আগেই ভারতে সমাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা করতে পেরেছিলেন বুদ্ধদেব এবং সেটাও কোনও হিংসা, রক্তক্ষয়, ধ্বংস অথবা একনায়কতন্ত্র ছাড়াই। তিনি ছিলেন আদ্যোপান্ত ধর্মবিশ্বাসী এবং ধর্মকে আফিম বলে মনে করা কমিউনিস্টদের তিনি ঘৃণা করতেন।

কমিউনিস্টদের ভন্ডামি সম্পর্কেও তিনি যথেষ্ট সতর্ক ছিলেন, "আম্বেদকর, যিনি শ্রমিকদের ধর্মঘটের অধিকারে বিশ্বাস করতেন, বলেছিলেন যে ধর্মঘটের অস্ত্রটি কমিউনিস্ট নেতাদের রাজনৈতিক উদ্দেশ্যের জন্য নয়, শ্রমিকদের সুবিধার জন্য ব্যবহার করা উচিত। তার চরিত্রগত সাহসিকতার সাথে তিনি তার দৃষ্টিভঙ্গি পুনর্ব্যক্ত করেছিলেন যে কমিউনিস্টরা শ্রমিকদের উন্নতির লক্ষ্যের চেয়ে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য নিয়েই ধর্মঘট করতে আগ্রহী ছিল (ধনঞ্জয় কির, ডঃ আম্বেদকর জীবন ও মিশন)।

কমিউনিস্টদের দ্বারা পরিচালিত শ্রমিক আন্দোলন সম্পর্কে তিনি বলেছেন, "তার কমিউনিস্টদের সাথে যোগদানের কোন সম্ভাবনা নেই। তিনি ঘোষণা করেছিলেন যে তিনি কমিউনিস্টদের একজন নিশ্চিত শত্রু, যারা তাদের রাজনৈতিক উদ্দেশ্যের জন্য শ্রমিকদের শোষণ করেছিল" (ধনঞ্জয় কির, ড. আম্বেদকর জীবন ও মিশন)।

কমিউনিস্টরাও আম্বেদকরের বিরোধিতায় সরাসরি মাঠে নেমেছিল। সিপিআই নেতা শ্রীপাদ ডাঙ্গের নেতৃত্বে কমিউনিস্টরা বোম্বে সেন্ট্রাল সিট থেকে কংগ্রেসের বিরুদ্ধে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী ডঃ আম্বেদকরকে হারিয়ে দিয়েছিল।

আজকে যারা সংবিধানের রক্ষক হিসেবে অবতীর্ণ, মোদী আম্বেদকরের সংবিধানকে ধ্বংস করে দেবে বলে চিৎকার করছে, সংবিধানের প্রতি তাদের সম্মান কতটা ছিল এবং তারা কি ধরণের সংবিধানের দাবী করেছিলেন তা দেখা যাক। ১৯৪৯ সালের ২৫শে নভেম্বর বাবাসাহেব আম্বেদকর ভারতের গণপরিষদে তাঁর শেষ ভাষণ প্রদান করেন। এই ভাষণে তিনি কমিউনিস্টদের সংবিধান বিরোধী এবং গণতন্ত্র বিরোধী ভুমিকাকে তুলে ধরেন, "সংবিধানের নিন্দা মূলত দুটি মহল থেকে আসে, কমিউনিস্ট পার্টি এবং সমাজতান্ত্রিক দল। কেন তারা সংবিধানের নিন্দা করে? এটা কি আসলেই খারাপ সংবিধান? আমার মতে তা নয়। কমিউনিস্ট পার্টি সর্বহারা শ্রেণীর একনায়কত্বের নীতির উপর ভিত্তি করে একটি সংবিধান চায়। তারা সংবিধানের নিন্দা করে কারণ এটি সংসদীয় গণতন্ত্রের উপর ভিত্তি করে। সমাজতন্ত্রীরা দুটি জিনিস চায়। তারা প্রথম জিনিসটি চায় যে তারা ক্ষমতায় এলে সংবিধানে তাদের ক্ষতিপূরণ না দিয়ে সকল ব্যক্তিগত সম্পত্তি জাতীয়করণ বা

সামাজিকীকরণের স্বাধীনতা দিতে হবে। সমাজতন্ত্রীরা দ্বিতীয় যেটি চায় তা হল সংবিধানে উল্লিখিত মৌলিক অধিকারগুলি অবশ্যই নিরঙ্কুশ এবং কোনো সীমাবদ্ধতা ছাড়াই হতে হবে যাতে তাদের দল ক্ষমতায় আসতে ব্যর্থ হলে তাদের কেবল সমালোচনা করার নয়, বরং সরকারকে ক্ষমতাচ্যুত করারও নিরবচ্ছিন্ন স্বাধীনতা থাকে" (Dr B R Ambedkar's last speech in the Constituent Assembly on adoption of the constitution (25th Novembr 1949 (~ Indian Politics – Interesting insights (primepoint.in)।

পরিশেষে বলি যে বাবাসাহেব হিন্দু সমাজের সামাজিক শৃঙ্খলা, তাঁর মতে যা প্রধানত বর্ণপ্রথার ভিত্তির উপরে প্রতিষ্ঠিত, সেই বর্ণপ্রথার কঠোর সমালোচক হলেও তিনি হিন্দু সমাজের সংস্কারের মাধ্যমে এই কুপ্রথার অবসান ঘটানোর জন্যই আগ্রহী ছিলেন। ১৯৩৫ সালে তিনি ঘোষণা করেন যে তিনি হিন্দু হয়ে জন্মগ্রহণ করেছেন, কিন্তু হিন্দু হয়ে মৃত্যুবরণ করবেন না। এই ঘোষণার ফলে তৎকালীন ধর্মীয়, সামাজিক এবং রাজনৈতিক হিন্দু নেতাদের কাছ থেকে এবং সামগ্রিকভাবে হিন্দু সমাজের কাছ থেকে সদর্থক প্রতিক্রিয়ার জন্য ২১ বছর অপেক্ষা করেছিলেন। এই সময়ে তাঁর কাছে পোপের প্রতিনিধি এসেছিলেন, নিজামের প্রতিনিধি এসেছিলেন। কিন্তু তিনি তাদের আহ্বানে সাড়া দিয়ে খ্রীস্টান অথবা মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করেন নি। তিনি জানতেন যে তাঁর সাথে সাথে তাঁর লক্ষ লক্ষ সমর্থক যদি খ্রীস্টান অথবা মুসলমান হয়ে যায়, তাহলে তাঁর মৃত্যুর পরে তাঁর এই সমর্থকরা বিচ্ছন্নতাবাদী শক্তিগুলোর ষড়যন্ত্রের শিকার হবে এবং সময়ের সাথে সাথে ভারতবর্ষের ভিন্ন ভিন্ন অঞ্চলে ধর্মের ভিত্তিতে বিচ্ছিন্নতাবাদ মাথা চাড়া দেবে। এই পরিস্থিতিতে ভারতবর্ষ অসংখ্য টুকরোতে বিভক্ত হয়ে যেতে পারে। তিনি বলেছিলেন তাঁর অনুগামীরা যদি মুসলমান অথবা খ্রীষ্টান হয়ে যান, তাহলে তাঁরা 'De-Nationalised' হয়ে যাবেন। এই প্রসঙ্গে গান্ধিজীকে তিনি বার্তা দিয়েছিলেন যে তাঁর সিদ্ধান্তের ফলে ভারতের অখণ্ডতার উপরে কোনও আঁচ আসবে না এবং যাতে হিন্দু সমাজের যথা সম্ভব কম ক্ষতি হয়, সেকথাও তিনি ভববেন। প্রসঙ্গত, তৎকালীন সময়ে সাভারকার বলেছিলেন বর্ণপ্রথা সেকেলে হয়ে গিয়েছে। বর্তমানে এই প্রথার কোনও প্রাসঙ্গিকতা নেই। কিন্তু গান্ধীজি বর্ণপ্রথার কট্টর সমর্থক ছিলেন। দীর্ঘ প্রতীক্ষার পরেও বাবাসাহেব হিন্দু সমাজের কাছ থেকে কোনও ইতিবাচক প্রতিক্রিয়া না পেয়ে অবশেষে ১৯৫৬ সালে ভারতের মাটিতে জন্ম নেওয়া বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করেন।

তাঁর জীবদ্দশায় হিন্দু সমাজের মধ্যে তাঁর ঈপ্সিত সংস্কারের প্রতিফলন তিনি দেখে যেতে পান নি একথা সত্য। কিন্তু হিন্দু সমাজের মধ্যে জন্ম নেওয়া অস্পৃশ্যতা নামক ব্যাধিকে শেষ করার জন্য সামাজিক আন্দোলন কখনও থেমে যায় নি। হিন্দুদের সর্ববৃহৎ সামাজিক সংগঠন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের প্রধান শ্রদ্ধাস্পদ মোহন রাও ভাগবত স্পষ্ট ঘোষণা করেছেন যে অস্পৃশ্যতা ধর্ম নয়, ঘোর অধর্ম, বিশ্ব হিন্দু পরিষদ বহু পূর্বেই ঘোষণা করেছে "ন হিন্দু পতিত ভবেৎ"। হিন্দু সমাজের এই সমস্যার সমাধান হিন্দুদেরই করতে হবে। হিন্দু বিরোধী, ধর্ম বিরোধী বাম-বামাতিদের কুম্ভীরাশ্রু দেখে এবং সামনে রাখা বাবাসাহেবের ছবি দেখে এই বাম-বামাতিদের পাতা ফাঁদে কেউ যাতে পা না দেয়, সেদিকে সতর্ক দৃষ্টি সকলকে রাখতে হবে এবং বাবাসাহেব বামপন্থীদের কোন চোখে দেখতেন সেটাও সকলের কাছে তুলে ধরতে হবে।

ডঃ ভীমরাও আম্বেদকর ও তাঁর পাকিস্তান ভাবনা

বিনয়ভূষণ দাশ

ডঃ আম্বেদকর লিখেছেন, The Muslim way of escape from this (so-called) tyranny of a Hindu Centre is to have no Central Government in India at all. আমরা আজকের ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে মুসলিম রাজনীতির হালহকিকত বিশ্লেষণ করলেই ডঃ আম্বেদকরের উক্তির সেই সারবত্তা অনুধাবন করতে পারি।

সাম্প্রতিককালে ডঃ ভীমরাও আম্বেদকরের সামাজিক ভাবনা, সংবিধান রচনায় তাঁর বিশেষ অবদান ইত্যাদি বিষয়ে বহুল আলোচনা হলেও সামগ্রিকভাবে তাঁর স্বদেশভাবনা, পাকিস্তান গঠন বিষয়ে তাঁর ভাবনা সেভাবে আলোচিত হয়না। অথচ,পূর্বতন পূর্ব পাকিস্তান তথা বর্তমান বাংলাদেশের চলমান ঘটনার প্রেক্ষিতে তাঁর চিন্তাভাবনার দিকটি বিশেষভাবে আলোচিত হবার যোগ্য। ১৯৪৫ সালে প্রকাশিত 'Pakistan or the Partition of India'- গ্রন্থে পাকিস্তান সৃষ্টি সম্পর্কে তাঁর চিন্তাভাবনা বিশেষভাবে প্রকাশিত হয়েছে। এছাড়া তাঁর Thoughts on Pakistan (প্রকাশিত ১৯৫৫ সালে) গ্রন্থটিও এ বিষয়ে বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই বই দুটি পড়লে পাকিস্তান গঠন সম্পর্কে তাঁর চিন্তা কতটা বাস্তবসম্মত ছিল তা বিশেষভাবে অনুধাবন করা যায়। আমরা হয়ত সব ক্ষেত্রে তাঁর সঙ্গে সহমত হতে নাও পারি, কিন্তু ওই পুস্তক দুটি পাঠ করলে বোঝা যায়, তাঁর ইতিহাস জ্ঞান কতটা প্রখর ছিল; মুসলিম মানসিকতা সম্পর্কে তাঁর অধ্যয়ন কতটা গভীর ছিল। ১৯৪০ সালের মার্চ মাসে লাহোর অধিবেশনে মুসলিম লীগের 'পাকিস্তান প্রস্তাব' গ্রহণের পরে ১৯৪৫ খ্রিস্টাব্দে তাঁর এই পুস্তকটি প্রকাশিত হয়। তিনি তাঁর গ্রন্থের ভুমিকার শুরুতেই লিখেছেন, "(At that time) Others have taken it as a permanent frame of the Muslim mind and not merely a passing phase and have in consequence been greatly perturbed." তাঁর এই ভাবনা যে কতটা বাস্তব সম্মত তা আজকের বাংলাদেশের ঘটনাক্রমের দিকে তাকালেই বোঝা যায়। সেই নেহরু-গান্ধীর আধিপত্যের যুগে ডঃ আম্বেদকর কতটা বাস্তবসম্মত চিন্তা ভাবনা করতেন সেটা বোঝা যায়, বিষয়টি নিয়ে তাঁর একটি গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ রচনার মধ্যেই। গান্ধী-নেহরু যে মুসলিম লীগের লাহোর অধিবেশনে গৃহীত এই পাকিস্তান প্রস্তাবকে কোন গুরুত্বই দেয়নি সেটা তাঁদের পরবর্তী কর্মপদ্ধতিতে প্রতীয়মান হয়। গান্ধী-নেহরুর নাম না করে তিনি তাঁর ওই গ্রন্থের ভুমিকাতেই বলেছেন, "Others think that it (Lahore Resolution) need not be taken seriously. They treat it as a

trifle and try to destroy it by shooting into it similes and metaphors.", অর্থাৎ অন্যরা ভাবছে যে, লাহোর প্রস্তাবকে খুব গুরুত্ব দেবার দরকার নেই; তাঁরা এই প্রস্তাবকে তুচ্ছ বা মূল্যহীন ভাবছে এবং বক্তৃতায় উপমা ও রুপক ব্যবহার করেই এই প্রস্তাব ধ্বংস করে দেবে।

আসলে কংগ্রেস ও তার নেতৃবৃন্দ মুসলিম লীগ ও তার কার্যকলাপকে কখনও গুরুত্ব দিয়ে দেখেনি। শুধু ডঃ আম্বেদকরের মত বাস্তববাদী নেতাই নয়, ফ্রান্সিস টুকেরের এর মত ইংরাজ সেনানী তথা প্রসাশকও একথা বুঝেছিলেন। ফ্রান্সিস টুকের তাঁর While Memory Serves নামক গুরুত্বপূর্ণ স্মৃতিচারণমুলক গ্রন্থেও এ কথা উল্লেখ করেছেন। তিনি লিখেছেন, 'One great reality of Indian politics has for years been communalism. But unfortunately the Congress Party hid it from the world, with the inevitable result that India today is decisively parted into at least two nations." (p.125)। অবশ্য ক্ষমতালোভী কংগ্রেস নেতৃত্ব দেশ ভাগ করার পরেও এ সত্য অনুধাবন করেনি, অথবা বর্তমান ক্ষমতালোভী কংগ্রেস নেত্রী সোনিয়া গান্ধী আর রাহুল গান্ধী নিতান্তই ক্ষমতা পাওয়ার উদগ্র বাসনায় এসব চেপে যাচ্ছে। অথবা, দেশের ইতিহাস ও সংস্কৃতি সম্পর্কে এঁরা নেহাতই অজ্ঞ।

আর এইখানেই রয়েছে ডঃ আম্বেদকরের চিন্তাভাবনার স্বকীয়তা। তিনি লীগের পাকিস্তান প্রস্তাব গ্রহণের পরেই বিষয়টির নানা দিক নিয়ে চিন্তাভাবনা করেন। আর এই চিন্তাভাবনার ফসল হল তাঁর 'পাকিস্তান অর দি পার্টিশন অফ ইন্ডিয়া' গ্রন্থটি। এই গ্রন্থে তিনি পাকিস্তান প্রস্তাবের বিভিন্ন দিক ও তার সম্ভাব্য ফলাফল নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। গ্রন্থটিতে তিনি পাকিস্তান প্রস্তাবের পক্ষের যুক্তিগুলি আলোচনা করেছেন। পাকিস্তানের বিপক্ষে হিন্দুদের যুক্তিগুলি বিবৃত করেছেন। পাকিস্তান না হলে কি হতে পারে তা আলোচনা করেছেন; পাকিস্তান সৃষ্টি হলে তার কুফল কি হতে পারে তাও আলোচনা করেছেন বইটির চতুর্থ অংশ 'পাকিস্তান অ্যান্ড ম্যালাইসে'-তে। আর পঞ্চম অংশে তিনি আলোচনা করেছেন 'পাকিস্তান কি হতেই হবে' এবং পাকিস্তান হলে তার সমস্যা কি হতে পারে তাই নিয়ে। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করি, তাঁর এই গ্রন্থটি রচনার ঠিক পরের বৎসর, ১৯৪৬ সালে আরেকটি বিখ্যাত গ্রন্থ, ডঃ রাজেন্দ্র প্রসাদের 'ইন্ডিয়া ডিভাইডেড' গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়। ডঃ আম্বেদকর তাঁর নিজের লেখা এই গ্রন্থ সম্পর্কে লিখেছেন, It is an analytical presentation of Indian history and Indian politics in their communal

aspects. অর্থাৎ এটি (পুস্তকটি) হল সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিতে, মুসলমান ও হিন্দুর দৃষ্টিতে, ভারতীয় ইতিহাস ও ভারতীয় রাজনীতির উপস্থাপনা।

যাইহোক একটি প্রবন্ধের পরিসরে পুস্তকটির বিভিন্ন দিক এবং ডঃ আম্বেদকরের চিন্তাভাবনার গতি আলোচনা করা সম্ভব নয়। সুতরাং বইটির কয়েকটি বিশেষ দিক নিয়ে আলোচনাতে এই নিবন্ধ সীমিত রাখব। ডঃ আম্বেদকর পাকিস্তান প্রস্তাবের একটি বিশেষ দিককে খুব গুরুত্ব দিয়েছেন। সেটি হল, মুসলিম লীগ ওই প্রস্তাবে ঘোষণা করে যে তাঁরা চায়না দেশের কেন্দ্রে একটি কেন্দ্রীয় সরকার থাকুক। তাঁদের মতে ভারতের পাঁচটি প্রদেশে পরিষ্কার মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠতা আছে। তাঁদের মতে, ওই পাঁচটি প্রদেশে নিশ্চিতরূপেই মুসলিমরা সংখ্যাগরিষ্ঠতা পাবে এবং সরকার গঠন করবে। তাঁরা চায়, ওই পাঁচটি প্রদেশে যেন তাঁরা স্বাধীনভাবে সরকার চালাতে সক্ষম হয়। তাই তাঁরা চায়নি যে, হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠ কেন্দ্রীয় সরকার ওই পাঁচটি প্রদেশে কোনভাবে কর্তৃত্ব করুক। মুসলিমরা চায়নি যে সমগ্র দেশে একটা কেন্দ্রীয় সরকার থাকুক এবং হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠ সেই সরকার মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রদেশের উপর কর্তৃত্ব চালাক। তৃতীয় গোলটেবিল বৈঠকে মহম্মদ ইকবাল এই ধরণের প্রস্তাবই করেছিল। ডঃ আম্বেদকর লিখেছেন, The Muslim way of escape from this (so-called) tyranny of a Hindu Centre is to have no Central Government in India at all. আমরা আজকের ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে মুসলিম রাজনীতির হালহকিকত বিশ্লেষণ করলেই ডঃ আম্বেদকরের উক্তির সারবত্তা অনুধাবন করতে পারি।

তিনি মুসলিম সাম্প্রদায়িকতা ও তাঁদের পাকিস্তান দাবীকে শুধু তাৎক্ষণিক যুক্তিতে দেখেননি, বরং তিনি ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে মুসলিম সাম্প্রদায়িকতা ও পাকিস্তান দাবীর বিশ্লেষণ করেছেন। তিনি লিখেছেন, ১৯৩০ সালে মুসলিম লীগের লখনৌ অধিবেশনে কবি মহম্মদ ইকবাল, সভাপতির ভাষণে প্রথম পাকিস্তান প্রস্তাব করে, যদিও তখন এই প্রস্তাব গৃহীত হয়নি। পরবর্তীকালে রহমত আলী এই বিষয়টি আবার জাগিয়ে তোলে এবং পাকিস্তান নামটি তাঁরই দেওয়া। এক্ষেত্রে একটা কথা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যে, তাঁর এই প্রস্তাবে বাংলা বা আসামকে প্রস্তাবিত পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি। তিনি পাঞ্জাব, উত্তরপশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ, কাশ্মীর, সিন্ধুপ্রদেশ এবং বালুচিস্তানকে তাঁর উদ্দিষ্ট পাকিস্তানে অন্তর্ভুক্ত করেছিলেন। বাকি অংশ তাঁর কাছে হিন্দুস্তান হিসেবেই

চিহ্নিত ছিল। মুসলিম লীগ দ্বারা এই প্রস্তাবটি গোল টেবিল বৈঠকে সদস্যদের মধ্যে বিলি করা হলেও সরকারীভাবে এটি উপস্থাপন করা হয়নি। ব্যক্তিগতভাবে লীগ এটা ব্রিটিশ সরকারের দ্বারা অনুমোদন করিয়ে নেবার চেষ্টা করলেও ব্রিটিশ সরকার সেই সময় 'এটা 'পুরনো মুসলিম সাম্রাজ্যের' পুনঃপ্রচলন' মনে করে প্রস্তাবটি অস্বীকার করে।বাংলা ও আসামকে পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত করার বিষয়টি তাঁরা পরবর্তীকালে নিয়ে আসে।

পাকিস্তান দাবীর ঐতিহাসিক পটভূমি বিশ্লেষণ করেছেন ডঃ আম্বেদকর তাঁর এই পুস্তকে। তিনি ভারতে মুসলিম আক্রমণকে শুধু জমি দখলের অভিযান হিসেবে দেখেননি। তিনি মুসলিমদের ভারত আক্রমণের গুরুত্বপূর্ণ কারণ হিসেবে হিন্দুদের ধর্মীয় দিকটিকেও ভীষণ গুরুত্ব দিয়েছেন। তিনি লিখেছেন, But, there is no doubt that striking a blow at the idolatry and polytheism of Hindus and establishing Islam in India was also one of the aims of this expedition. তাঁর এই বক্তব্যের সপক্ষে তিনি হাজ্জাজকে লেখা মহম্মদ-বিন-কাশিমের চিঠি থেকে উদ্ধৃতি দিয়েছেন। এখানে উল্লেখ্য যে, দেশের বামপন্থী, নেহরুবাদী এবং আলীগড়পন্থী ঐতিহাসিকেরা বরাবর এই বিষয়টি এড়িয়ে গেছেন, অথবা চেপে গেছেন। গজনীর মহম্মদও ভারত অভিযানকে 'looked upon his numerous invasions of India as waging of a holy war.' তাঁর এই বক্তব্যের সপক্ষে তিনি আল উৎবি এবং ডঃ মুরে টাইটাসের পুস্তক থেকে প্রচুর উদ্ধৃতি দিয়েছেন। মহম্মদ ঘোরীও একই 'পবিত্র তাড়নায়' ভারতে আক্রমণ করেছিল। এই প্রসঙ্গে তিনি ঐতিহাসিক হাসান নিজামির পুস্তক থেকে উদ্ধৃতি দিয়েছেন, 'He purged by his sword the land of Hind from the filth of infidelity and vice, and freed the whole of that country from the thorn of God-plurality and the impurity of idol-worship, and by his royal vigour and intrepidity left not one temple standing. এছাড়াও তিনি ঐতিহাসিক Stanley Lane-poole, সাকি-মুস্তাইদ-খাঁ ও আরও অনেক ঐতিহাসিকের পুস্তক থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে মুসলিম লীগের 'পাকিস্তান' মানসিকতার ব্যাখ্যা করেছেন। অবাক হতে হয় প্রাতিষ্ঠানিক ঐতিহাসিকদের মুসলিম মানসিকতা ব্যাখ্যা করতে দ্বিধা দেখে। তিনি লিখেছেন, হিন্দুদের মন্দির লুট করা হয়েছিল এবং প্রচুর

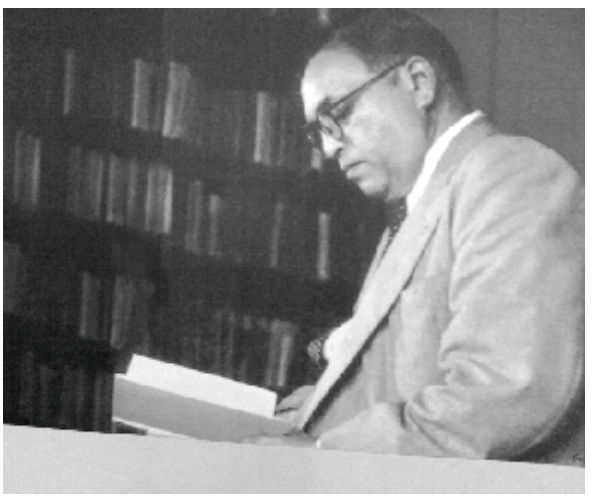

লুণ্ঠিত ধনরাশি তাঁর সৈন্যদের মধ্যে বন্টন করা হত। অনেক ঐতিহাসিকই মুসলিমদের মন্দির ধ্বংস করার বিষয়টি লঘু করে দেখাতে চেয়েছেন প্রমাণের স্বল্পতার কারণ দেখিয়ে। কিন্তু ডঃ আম্বেদকর ঐতিহাসিক Murray Titus কে উদ্ধৃত করে লিখেছেন, "Of the destruction of temples and the desecration of idols, we have an abundance of evidence." মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন।

যাইহোক প্রবন্ধের পরিসরে বিস্তারিত আলোচনার সুযোগ নেই। ডঃ আম্বেদকরের পুস্তক দুটিতে উত্থাপিত কয়েকটি বিষয় উল্লেখ করেই প্রবন্ধের উপসংহার টানব।

প্রথমত তিনি সম্ভাব্য 'জাতি-রাষ্ট্র' বা 'নেশন স্টেট' হিসেবে পাকিস্তান সৃষ্টির বাস্তবতা নিয়ে সন্দেহ প্রকাশ করেছেন। শুধু ধর্মীয় পরিচিতির উপর রাষ্ট্র গড়ে উঠলে তার অভ্যন্তরীণ স্থায়িত্ব নিয়ে সন্দেহ প্রকাশ করেছেন। তিনি শুধুমাত্র ধর্মীয় পরিচিতির উপর রাষ্ট্র গড়ে তুললে তার অন্তর্নিহিত বিপদের সমূহ সম্ভাবনা। তিনি সংখ্যালঘুদের অধিকার রক্ষার বিষয়টিও তিনি উল্লেখ করেছেন। পাকিস্তান শেষ পর্যন্ত গঠিত হলে তিনি দু দেশের মধ্যে জনবিনিময়ের প্রস্তাব করেছেন। এই ব্যাপারে তাঁর চিন্তার অংশীদার ছিলেন ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, পুরুষোত্তমদাস ট্যান্ডন, সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল প্রভৃতি নেতৃবৃন্দ। আন্তর্জাতিক ইতিহাসে জনবিনিময়ের দৃষ্টান্তও রয়েছে। ১৯২২ সালে তুরস্ক ও গ্রীস দুদেশের মধ্যে মধ্যে 'জন-বিনিময়ের' চুক্তি করে এবং আন্তর্জাতিক তত্বাবধানে এই জন-বিনিময় সম্পন্ন হয়। আর বিস্ময়ের কথা হল, মহম্মদ আলী জিন্নাহও দু-দেশের মধ্যে জন-বিনিময়ের প্রস্তাব করেছিল এবং আমাদের দেশের প্রথম রাষ্ট্রপতি ডঃ রাজেন্দ্র প্রসাদ এই প্রস্তাব সমর্থন করেছিলেন। কিন্তু এতৎসত্বেও তাঁদের এই প্রস্তাব কার্যকারী হয়নি গান্ধী ও জওহরলালের অবিমৃশ্যকারিতায় আর তার জন্য ফল ভুগছে পূর্ব পাকিস্তান তথা বাংলাদেশের হিন্দুরা। তাঁদের সীমাহীন দুর্দশা স্বাধীনতার আগে থেকেই চলছে। ডঃ আম্বেদকর পাকিস্তানে জাতিগত ও সামাজিক সাম্যের কথা বলেছেন। সাম্প্রতিক বাংলাদেশের ঘটনার কথা মনে রাখলে এবং সংখ্যালঘু হিন্দুদের উপর অপ্রতিহত নির্যাতনের কথা মনে রাখলে তাঁর কথার সারবত্তা অনুভব করা যায়। ডঃ আম্বেদকর, ডঃ শ্যামাপ্রসাদ এবং পুরুষোত্তমদাস ট্যান্ডনের প্রস্তাব বাস্তবায়িত হলে স্বাধীনতা পরবর্তীকালে ভারত উপ-মহাদেশে হিন্দুরা চরম দুর্দশার হাত থেকে রক্ষা পেত।

মোদীজির 'মেক ইন ইন্ডিয়া' নীতির সুফল

হাজার হাজার কর্মসংস্থান বাংলায়

রাজ্যে ২০০ কোটি টাকা বিনিয়োগ করছে NIFA গোষ্ঠী

বিশ্বের ৩০টি দেশে ইঞ্জিনিয়ারিং পণ্য রফতানি করবে NIFA

ডানকুনি ও চন্দননগরে তৈরি হবে নতুন কারখানা

বাংলার যুব সম্প্রদায়ের কর্মসংস্থান সুনিশ্চিত করতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ মোদী সরকার!

/BJP4Bengal bjpbengal.org

নয়াদিল্লির রোহিনীতে শ্রী নরেন্দ্র মোদীর নির্বাচনী জনসভায় মানুষের স্রোত।

নয়াদিল্লির ভারত মন্ডপম-এ 'গ্রামীণ ভারত মহোৎসব ২০২৫'-এর শুভ সূচনায় প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী।

ওড়িশার ভুবনেশ্বরে ১৮তম প্রবাসী ভারতীয় দিবস সম্মেলনের উদ্বোধনে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। অনুষ্ঠানে অংশ নেয় ৭০টি দেশের প্রতিনিধিরা।

ভারতের প্রথম চালকবিহীন মেট্রো ট্রেন তৈরি হলো বাংলায়

ভারতের সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ শহরে মেট্রো পরিষেবা শুরু করতে কোমর বেঁধে কাজ করছে মোদী সরকার

সেই লক্ষ্যে দেশীয় প্রযুক্তিতে প্রথম চালকবিহীন মেট্রো ট্রেন তৈরি করল টিটাগড় রেল সিস্টেমস

বাংলার বুকে এটি দেশের অন্যতম সেরা ট্রেন কোচ ও রেল প্রযুক্তি নির্মাণ সংস্থা

স্টেনলেস স্টিলের তৈরি এই ট্রেনটি বেঙ্গালুরু মেট্রোর ইয়োলো লাইনে চলবে

বিজেপি

গোটা দেশের কাছে বাংলা ও বাঙালির পরিশ্রম এবং সাফল্যের কথা তুলে ধরছেন মোদীজি

/BJP4Bengal bjpbengal.org | সূত্র: মিডিয়া রিপোর্ট

ভারতীয় জনতা পার্টি পশ্চিমবঙ্গ শাখার পক্ষে জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক প্রকাশিত এবং অঙ্কিত প্রিন্টিং হাউস, কলকাতা - ৭০০ ০০৯ হইতে মুদ্রিত।